তৃতীয় অধ্যায়

শুদ্ধ ভক্তি ঃ হৃদয়ের পরিবর্তন

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

এবমেতন্নিগদিতং পৃষ্টবান্ যদ্ভবান্ মম।
নৃণাং যন্ম্রিয়মাণানাং মনুষ্যেষু মনীষিণাম্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুক উবাচ—শ্রী শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **এতৎ**—এই সমস্ত; **নিগদিতম্**—উত্তর দেওয়া হয়েছে; **পৃষ্টবান্**—আপনার প্রশ্ন অনুসারে; **যৎ**—যা; **ভবান্**—আপনি; **মম**—আমাকে; **নৃণাম্**—মানুষদের; **যৎ**—এক; **ম্রিয়মাণানাম্**—মরণোন্মুখ ব্যক্তির; **মনুষ্যেষু**—মানুষের মধ্যে; **মনীষিণাম্**—বুদ্ধিমান মানুষদের।

অনুবাদ

শ্রী শুকদেব গোস্বামী বললেন ঃ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, যেভাবে আপনি আমাকে মরণোন্মুখ বুদ্ধিমান মানুষদের কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন, সেই অনুসারে আমি আপনাকে উত্তর দিয়েছি।

তাৎপর্য

সারা পৃথিবী জুড়ে মানব সমাজে কোটি কোটি নর-নারী রয়েছে, এবং তাদের প্রায় সকলেই অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, কেননা আত্মার সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান অতি অল্প। তাদের প্রায় সকলেরই জীবন সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে, কেননা তারা তাদের স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড় শরীরকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করছে, যদিও বাস্তবে তারা তা নয়। মানব সমাজের বিচারে তারা উচ্চ অথবা নিম্ন স্তরে অবস্থিত হতে পারে, কিন্তু সকলেরই বিশেষভাবে জানা উচিত যে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের দেহ এবং মনের অতীত আত্মা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা না করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সমস্ত কার্যকলাপ ব্যর্থ। তাই হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কেবল একজন আত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারে এবং সেজন্য বেদান্ত-সূত্র, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত আদি শাস্ত্রগ্রন্থের শরণাগত হতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত গ্রন্থ শ্রবণ বা অধ্যয়ন করা সত্ত্বেও তত্ত্বজ্ঞানী সদগুরুর সান্নিধ্যে না আসা

পর্যন্ত আত্মার প্রকৃত স্বরূপ যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। লক্ষ লক্ষ মানুষদের মধ্যে কেবল দু-একজন মাত্র তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে (মধ্যলীলা ২০/১১২-১২৩) উল্লেখ করা হয়েছে—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
'শাস্ত্র-গুরু-আত্মা'রূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান॥

ব্যাসদেবরূপে অবতীর্ণ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে বৈদিক শাস্ত্রসমূহ দান করেছেন, যাতে বুদ্ধিমান মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন। বুদ্ধিমান মানুষেরাও ভগবানের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের কথা প্রায় ভুলে যাচ্ছেন। তাই ভক্তিযোগের পন্থা হচ্ছে সেই হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। মানব জীবনেই কেবল তা সম্ভব হয়, যা ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন যোনির মধ্যে অত্যন্ত দুর্লভ। তাই বুদ্ধিমান মানুষদের কর্তব্য নিশ্চিতভাবে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। সমস্ত মানুষেরাই বুদ্ধিমান নয়, তাই তারা সব সময় মানব জীবনের মহিমা উপলব্ধি করতে পারে না। তাই এই শ্লোকে *মনীষিণাম্*, অর্থাৎ চিন্তাশীল শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। মহারাজ পরীক্ষিতের মতো *মনীষিণাম্* ব্যক্তিরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে ভগবানের দিব্য নাম এবং লীলা রূপ হরিকথামৃত শ্রবণ, কীর্তন ইত্যাদির দ্বারা সর্বতোভাবে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনে যুক্ত হন। বিশেষভাবে এই কার্য মরণোন্মুখ ব্যক্তিদের করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ২—৭

ব্রহ্মবর্চসকামস্তু যজেত ব্রহ্মণঃ পতিম্।
ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্তু প্রজাকামঃ প্রজাপতীন্॥ ২॥
দেবীং মায়াস্তু শ্রীকামস্তেজস্কামো বিভাবসুম্।
বসুকামো বসূন্ রুদ্রান্ বীর্যকামোঽথ বীর্যবান্॥ ৩॥
অন্নাদ্যকামস্ত্বদিতিং স্বর্গকামোঽদিতেঃ সুতান্।
বিশ্বান্দেবান্ রাজ্যকামঃ সাধ্যান্ সংসাধকো বিশাম্॥ ৪॥
আয়ুষ্কামোঽশ্বিনৌ দেবৌ পুষ্টিকাম ইলাং যজেৎ।
প্রতিষ্ঠাকামঃ পুরুষো রোদসী লোকমাতরৌ॥ ৫॥
রূপাভিকামো গন্ধর্বান্ স্ত্রীকামোঽপ্সর উর্বশীম্।
আধিপত্যকামঃ সর্বেষাং যজেত পরমেষ্ঠিনম্॥ ৬॥
যজ্ঞং যজেদ্ যশস্কামঃ কোষকামঃ প্রচেতসম্।
বিদ্যাকামস্তু গিরিশং দাম্পত্যার্থ উমাং সতীম্॥ ৭॥

ব্রহ্ম —পরম ; **বর্চস**—জ্যোতি ; **কামস্তু**—যারা সেইভাবে কামনা করে ; **যজেত**—পূজা করে ; **ব্রহ্মণঃ**—বেদের ; **পতিম্**—প্রভু ; **ইন্দ্রম্**—স্বর্গের রাজা ইন্দ্র ; **ইন্দ্রিয়কামস্তু**—যারা কেবল প্রবল ইন্দ্রিয়কামনা করে ; **প্রজা-কামঃ**—যারা বহু সন্তান-সন্ততি কামনা করে ; **প্রজাপতীন্**—প্রজাপতিদের ; **দেবীম্**—দেবী ; **মায়াম্**—জড়া প্রকৃতির পালনকর্ত্রীকে ; **তু**—কিন্তু ; **শ্রীকামঃ**—যারা সৌন্দর্যকামনা করে ; **তেজঃ**—শক্তি ; **কামঃ**—যারা কামনা করে ; **বিভাবসুম্**—অগ্নিদেব ; **বসুকামঃ**—যারা সম্পদ কামনা করে ; **বসূন্**—বসু দেবতাগণ ; **রুদ্রান্**—শিবের রুদ্র অংশকে ; **বীর্যকামঃ**—যারা বলিষ্ঠ হতে চায় ; **অথ**—তাই ; **বীর্যবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী ; **অন্ন-অদ্য**—শস্য ; **কামঃ**—যারা কামনা করে ; **তু**—কিন্তু ; **অদিতিম্**—দেবতাদের মাতা অদিতি ; **স্বর্গ**—স্বর্গলোক ; **কামঃ**—যারা কামনা করে ; **অদিতেঃ সুতান্**—অদিতির পুত্রদের ; **বিশ্বান্**—বিশ্বদেব ; **দেবান্**—দেবতারা ; **রাজ্যকামঃ**—যারা রাজ্য কামনা করে ; **সাধ্যান্**—সাধ্যদেবদের ; **সংসাধকঃ**—যা ইচ্ছাপূর্ণ করে ; **বিশাম্**—বৈশ্য সম্প্রদায়দের ; **আয়ুষ্কামঃ**—যারা দীর্ঘ আয়ু কামনা করে ; **অশ্বিনৌ**—অশ্বিনী কুমার নামক ভ্রাতৃদ্বয় ; **দেবৌ**—দুইজন দেবতা ; **পুষ্টিকামঃ**—যারা সুগঠিত শরীর কামনা করে ; **ইলাম্**—পৃথিবীকে ; **যজেৎ**—পূজা করে ; **প্রতিষ্ঠাকামঃ**—যারা যশ কামনা করে অথবা পদের স্থিরতা কামনা করে ; **পুরুষঃ**—এই প্রকার ব্যক্তিরা ; **রোদসী**—দিগন্ত ; **লোকমাতরৌ**—পৃথিবীকে ; **রূপ**—সৌন্দর্য ; **অভিকামঃ**—নিশ্চিতরূপে যারা কামনা করে ; **গন্ধর্বান্**—গন্ধর্ব লোকের অধিবাসীদের যারা অত্যন্ত সুন্দর এবং সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ; **স্ত্রীকামঃ**—যারা ভাল পত্নী কামনা করে ; **অপ্সরঃ উর্বশীম্**—স্বর্গের অপ্সরা, উর্বশী নামক সুরকামিনীগণের ; **আধিপত্য-কামঃ**—যারা অন্যদের উপর আধিপত্য করতে চায় ; **সর্বেষাম্**—সকলের ; **যজেত**—পূজা করা কর্তব্য ; **পরমেষ্ঠিনম্**—ব্রহ্মাণ্ডের অধিকর্তা ব্রহ্মার ; **যজ্ঞম্**—পরমেশ্বর ভগবান ; **যজেৎ**—পূজা করা কর্তব্য ; **যশঃকামঃ**—যশের আকাঙ্ক্ষী ; **কোষকামঃ**—ধনাকাঙ্ক্ষী ; **প্রচেতসম্**—স্বর্গের কোষাধ্যক্ষ কুবেরকে ; **বিদ্যা-কামস্তু**—বিদ্যা লাভের আকাঙ্ক্ষী ; **গিরিশম্**—হিমালয়ের ঈশ্বর শিবের ; **দাম্পত্য-অর্থঃ**—দাম্পত্য প্রেমের জন্য ; **উমাম্-সতীম্**—শিবের সতী পত্নী উমাকে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি ব্রহ্মতেজ কামনা করেন, তাঁর বেদপতি (ব্রহ্মা অথবা বৃহস্পতির) আরাধনা করা উচিত। যিনি ইন্দ্রিয়-তর্পণের পটুতা কামনা করেন, তাঁর দেবরাজ ইন্দ্রের আরাধনা করা উচিত, এবং যিনি পুত্রাদি কামনা করেন, তাঁর প্রজাপতিদের আরাধনা করা উচিত। যিনি শ্রী কামনা করেন, তাঁর প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দুর্গাদেবীর আরাধনা করা উচিত। যিনি তেজ কামনা করেন তাঁর অগ্নিকে আরাধনা করা উচিত, এবং যিনি ধন কামনা করেন, তাঁর অষ্টবসুর আরাধনা করা উচিত। যিনি বল এবং বীর্য কামনা করেন, তাঁর শিবের অংশ রুদ্রের আরাধনা করা উচিত। যিনি প্রচুর পরিমাণে শস্য কামনা

করেন, তাঁর অদিতির আরাধনা করা উচিত। যিনি স্বর্গ কামনা করেন, তাঁর আদিত্যদের উপাসনা করা উচিত। যিনি রাজ্য কামনা করেন, তাঁর বিশ্বদেবের উপাসনা করা উচিত, এবং যিনি জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করতে চান, তাঁর সাধ্যদেবের পূজা করা উচিত। যিনি দীর্ঘায়ু কামনা করেন, তাঁর অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের আরাধনা করা উচিত, এবং যিনি দেহের পুষ্টি কামনা করেন, তাঁর পৃথিবীকে পূজা করা উচিত। যিনি প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্বপদে স্থিত থাকার কামনা করেন, তাঁর অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীর আরাধনা করা উচিত। যিনি রূপ কামনা করেন, তাঁর গন্ধর্বরূপ আরাধনা করা উচিত। যিনি স্ত্রী কামনা করেন, তাঁর উর্বশী-অপ্সরার আরাধনা করা উচিত। যিনি সকলের উপর আধিপত্য কামনা করেন, তাঁর ব্রহ্মাকে আরাধনা করা উচিত। যিনি যশ আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁর পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা উচিত এবং যিনি ধন সঞ্চয়ের অভিলাষী, তাঁর কুবেরের আরাধনা করা উচিত। যিনি বিদ্যালাভের অভিলাষ করেন, তাঁর শিবের আরাধনা করা উচিত, এবং তিনি দাম্পত্য-প্রেম কামনা করেন, তাঁর সতী উমাদেবীর আরাধনা করা উচিত।

তাৎপর্য

বিভিন্ন বিষয়ে সাফল্য লাভ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন রকম পূজার বিধি রয়েছে। জড় জগতের সীমার মধ্যে আবদ্ধ জীবেরা সব রকম ভোগের বিষয়ে দক্ষ না হতে পারে, কিন্তু উপরোক্ত বিশেষ বিশেষ দেবতাদের আরাধনা করার মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারে। শিবের আরাধনা করার ফলে রাবণ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েছিল এবং সে শিবের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য মাথাগুলি কেটে তাঁকে তা নিবেদন করত। শিবের কৃপায় সে এত শক্তিশালী হয়েছিল যে, স্বর্গের সমস্ত দেবতারা পর্যন্ত তার ভয়ে ভীত ছিল। অবশেষে সে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল এবং তার ফলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছিল। অর্থাৎ, এই সমস্ত ব্যক্তিরা যারা সামগ্রিকভাবে অথবা আংশিকভাবে জড় সুখভোগ করতে চায়, অর্থাৎ স্থূল জড়বাদীরা প্রকৃতপক্ষে স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন একথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/২০) প্রতিপন্ন হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কামনার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে,অর্থাৎ মায়ার প্রভাবে যাদের বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়েছে, তারাই বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করার মাধ্যমে জড়জাগতিক সুখভোগ করতে চায় অথবা বৈজ্ঞানিক প্রগতির মাধ্যমে জাগতিক উন্নতি সাধন করতে চায়।

জড়জাগতিক জীবনের প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি, এবং সেই সমস্যাগুলির সমাধান করাই হচ্ছে মানব জীবনের প্রকৃত কর্তব্য। কেউই চায় না তার জন্মগত অধিকার ত্যাগ করতে, কেউই চায় না মরতে, কেউই চায় না জরাগ্রস্ত হতে বা ব্যাধিগ্রস্ত হতে। কিন্তু কোন দেবতার কৃপায় অথবা জড় বিজ্ঞানের তথাকথিত উন্নতি সাধনের মাধ্যমে এই সমস্ত সমস্যাগুলির সমাধান করা সম্ভব হয় না।

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় এবং শ্রীমদ্ভাগবতে এই সমস্ত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সব রকম সদ্‌গুণবর্জিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শুকদেব গোস্বামী বলেছেন যে ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন প্রকার জীবের মধ্যে মানব জীবন হচ্ছে অত্যন্ত দুর্লভ এবং মূল্যবান, এবং এই সমস্ত মানুষদের মধ্যে জড় জগতের সমস্যাগুলির সমাধানে সচেষ্ট ব্যক্তির সংখ্যা আরও দুর্লভ ; তার থেকেও দুর্লভ হচ্ছে সেই প্রকার মানুষেরা যারা শ্রীমদ্ভাগবতের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন, কেননা শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধভক্তদের বাণী রয়েছে। বুদ্ধিমান এবং মূর্খ নির্বিশেষে সকলের জন্যই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে মনীষী বলে বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ তাঁর অনুভব অত্যন্ত উন্নত, কেননা মৃত্যুর ঠিক পূর্বে তিনি সমস্ত জড়ভোগ ত্যাগ করে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতো উপযুক্ত ব্যক্তির শ্রীমুখ থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হয়েছেন।

জড় সুখভোগের প্রচেষ্টার সব সময়ই নিন্দা করা হয়েছে। সেই সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পতিত মানব সমাজের নেশার মতো। বুদ্ধিমান মানুষদের কর্তব্য হচ্ছে সেই সমস্ত প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে ত্যাগ করে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়ে নিত্য জীবন লাভের চেষ্টা করা।

শ্লোক ৮

ধর্মার্থ উত্তমশ্লোকং তন্তুঃ তন্বন্ পিতৃন যজেৎ।
রক্ষাকামঃ পুণ্যজনানোজস্কামো মরুদগণান্ ॥ ৮ ॥

ধর্ম-অর্থঃ—পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য ; **উত্তমশ্লোকম্**—পরমেশ্বর ভগবান অথবা ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিদের ; **তন্তুঃ**—সন্তানের জন্য ; **তন্বন্**—এবং তাদের সুরক্ষার জন্য ; **পিতৃন**—পিতৃকুল ; **যজেৎ**—পূজা করা উচিত ; **রক্ষাকামঃ**—যারা সুরক্ষার আকাঙ্ক্ষা করে ; **পুণ্যজনান্**—পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গ ; **ওজঃ-কামঃ**—শক্তিকামী ; **মরুদগণান্**—দেবতাদের।

অনুবাদ

পারমার্থিক জ্ঞানের উন্নতি সাধনের জন্য শ্রীবিষ্ণু অথবা তাঁর ভক্তদের আরাধনা করা উচিত। যাঁরা সন্তানাদির কামনা করেন, তাঁদের পিতৃবর্গের আরাধনা করা উচিত, যাঁরা সুরক্ষা কামনা করেন, তাঁদের পুণ্যবান যক্ষসমূহের এবং যাঁরা বল কামনা করেন, তাঁদের বিভিন্ন দেবতাদের আরাধনা করা উচিত।

তাৎপর্য

ধার্মিক হওয়ার অর্থ হচ্ছে পারমার্থিক পথে উন্নতি সাধন করা, এবং অবশেষে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নির্বিশেষ দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটায়, তাঁর অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে এবং চরমে তাঁর

সবিশেষ ভগবান রূপের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। যাঁরা রাজ্য কামনা করেন এবং অনিত্য দেহের উন্নতি কামনা করেন, তাঁদের কর্তব্য পিতৃবর্গ এবং অন্যান্য পুণ্যবান লোকসমূহের দেবতাদের শরণাগত হওয়া। বিভিন্ন দেবতাদের বিভিন্ন শ্রেণীর পূজকেরা চরমে এই ব্রহ্মাণ্ডে তাঁদের লোকে যেতে পারেন, কিন্তু যাঁরা ব্রহ্মজ্যোতিতে চিন্ময় লোকে প্রবেশ করেন, তাঁদের সাফল্য অনেক উন্নত স্তরের।

শ্লোক ৯

রাজ্যকামো মনূন্ দেবান্ নির্ঋতিং ত্বভিচরন্ যজেৎ।
কামকামো যজেৎ সোমমকামঃ পুরুষং পরম্ ॥ ৯ ॥

রাজ্য-কামঃ—সাম্রাজ্য লাভের আকাঙ্ক্ষী; **মনূন্**—ভগবানের আংশিক অবতার মনুদের; **দেবান্**—দেবতাদের; **নির্ঋতিন্**—অসুরেরা; **তু**—কিন্তু; **অভিচরণ্**—শত্রুবিজয়ের আকাঙ্ক্ষী; **যজেৎ**—পূজা করা উচিত; **কাম-কামঃ**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের আকাঙ্ক্ষী; **যজেৎ**—আরাধনা করা উচিত; **সোমম্**—চন্দ্রদেবকে; **অকামঃ**—যাঁর কোন জড় বাসনা নেই; **পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরম**—পরম।

অনুবাদ

যিনি রাজত্ব কামনা করেন, তাঁর মনুদের আরাধনা করা উচিত। যিনি শত্রুবিজয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁর অসুরদের আরাধনা করা উচিত, এবং যিনি ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনা করেন, তাঁর চন্দ্রদেবের আরাধনা করা উচিত। কিন্তু যাঁর কোন জড় সুখভোগের বাসনা নেই, তাঁর পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা উচিত।

তাৎপর্য

মুক্ত পুরুষ উপরোক্ত সমস্ত ভোগগুলি সম্পূর্ণ অর্থহীন বলে মনে করে। কেবল যারা বহিরঙ্গা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা আবদ্ধ, তারাই বিভিন্ন রকম জড় সুখভোগের আকাঙ্ক্ষার বন্ধনে আবদ্ধ। অর্থাৎ, পরমার্থবাদীদের কোন রকম জড় বাসনা থাকে না, কিন্তু জড়বাদীরা নানা প্রকার ভোগ বাসনার আকাঙ্ক্ষী। ভগবান ঘোষণা করেছেন যে, জড় সুখভোগের আকাঙ্ক্ষী জড়বাদীরা; যারা পূর্বে বর্ণিত বিভিন্ন দেবতাদের অনুগ্রহ ভিক্ষা করে, কখনোই তাদের ইন্দ্রিয় দমন করতে পারে না এবং তাই তারা নানারকম অর্থহীন কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। তাই কখনো কোনরকম জড় সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা না করে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা উচিত।

মূর্খ মানুষদের নেতারা আরও অধিক মূর্খ, কেননা তারা প্রকাশ্যভাবে প্রচার করে যে, যে কোন দেবতাদের পূজা করা যেতে পারে কেননা চরমে তার ফল একই। এই ধরনের প্রচার কেবল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষার বিরোধীই নয়, তা মূঢ়তাও বটে, এবং এটি যে কোন একটি ট্রেনের টিকিট কিনে একই গন্তব্যে পৌঁছনোর

দাবী করার মতো মূঢ়তা। কেউই বরোদার টিকিট কিনে দিল্লী থেকে বোম্বাই যেতে পারে না।

এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বিভিন্ন বাসনার দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রকার পূজার বিধি রয়েছে, কিন্তু যার কোনরকম জড় ভোগ বাসনা নেই, তিনিই কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতে পারেন। এই আরাধনার পদ্ধতিকে বলা হয় ভগবদ্ভক্তি।

শুদ্ধভক্তির অর্থ হচ্ছে সবরকম জড় বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে, এমন কি সকাম কর্ম এবং মনোধর্মী জ্ঞানের বাসনা থেকেও মুক্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা। জড় বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ভগবানের আরাধনা করা যায়, কিন্তু তার ফল ভিন্ন, যে কথা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হবে।

সাধারণত ভগবান কারও ইন্দ্রিয় সুখভোগের জড় বাসনা চরিতার্থ করেন না, কিন্তু ভগবান এই প্রকার পূজকদের পুরস্কৃত করেন, কেননা চরমে তারা সমস্ত জড় সুখভোগের বাসনা ত্যাগ করেন। এখানে সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, জড় সুখভোগের বাসনা হ্রাস করা উচিত, এবং সেই জন্য পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা উচিত, যাঁকে এখানে পরম বা জড়াতীত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যও বলেছেন—*নারায়ণঃ পরো হ্যব্যক্তাৎ ঃ* পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ জড়া প্রকৃতির অতীত।

শ্লোক ১০

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ১০ ॥

অকামঃ—যিনি সব রকম জড় বাসনার অতীত ; **সর্বকামঃ**—যিনি সব রকম জড় কামনাযুক্ত ; **বা**—অথবা ; **মোক্ষকামঃ**—মুক্তিকামী ; **উদারধীঃ**—বিশাল বুদ্ধিসম্পন্ন ; **তীব্রেণ**— তীব্র ; **ভক্তিযোগেন**—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা ; **যজেত**—আরাধনা করা উচিত ; **পুরুষম্ পরম্**—পরম পুরুষ ভগবানকে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম জড় কামনাযুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কতর্ব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে *পুরুষোত্তম* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনিই কেবল তাঁর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতিতে নির্বিশেষবাদীদের আত্মসাৎ

করে মুক্তিদান করতে পারেন। ব্রহ্মজ্যোতি ভগবানের থেকে ভিন্ন নয়, ঠিক যেমন সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ সূর্যমণ্ডল থেকে স্বতন্ত্র নয়। তাই যিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষী, তাঁরও কর্তব্য ভক্তিযোগের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করা, যে কথা এখানে শ্রীমদ্ভাগবতে নির্দিষ্ট হয়েছে। এখানে সর্ব প্রকার সিদ্ধিলাভের উপায় স্বরূপ ভক্তিযোগের পন্থাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ উভয়েরই চরম লক্ষ্য হচ্ছে ভক্তিযোগ, তেমনই এই অধ্যায়ে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে যে ভক্তিযোগ হচ্ছে বিভিন্ন দেবতাদের বিভিন্ন প্রকার পূজার চরম লক্ষ্য। ভক্তিযোগকে এখানে আত্মোপলব্ধির চরম উপায় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই নিষ্ঠা সহকারে এই ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করা সকলেরই কর্তব্য। এমন কি যারা জড় সুখভোগের আকাঙ্ক্ষী অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষী, তাদেরও নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তির এই পন্থা অবলম্বন করা কর্তব্য।

অকাম হচ্ছেন তিনি, যাঁর কোন জড় বাসনা নেই। *পুরুষং পূর্ণং* বা পূর্ণ পুরুষের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই জীবের প্রবৃত্তি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা, ঠিক যেমন দেহের বিভিন্ন অঙ্গগুলি স্বাভাবিকভাবে পূর্ণ দেহের সেবা করে। তাই কামনাশূন্য হওয়া মানে পাথরের মতো জড় হয়ে যাওয়া নয়, পক্ষান্তরে প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমেই কেবল সন্তুষ্ট হওয়ার বাসনা করা। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর সন্দর্ভে এই অকামভাবের ব্যাখ্যা করে বলেছেন, *ভজনীয়-পরম-পুরুষ-সুখমাত্র-স্ব-সুখত্বম্*। অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা অনুভব করে মানুষের প্রসন্ন হওয়া উচিত। জীবের এই স্বজ্ঞা বা স্বচেতনা ভৌতিক জগতে বদ্ধ অবস্থাতেও কখনো কখনো প্রকাশ পায়, এবং এই স্বজ্ঞা অল্পজ্ঞ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অবিকশিত চেতনায় পরার্থবাদ, পরোপকার, সমাজবাদ, সাম্যবাদ ইত্যাদি রূপে প্রকাশ পায়। জড়জাগতিক স্তরে সমাজ, জাতি, পরিবার, দেশ অথবা মানব সমাজের কল্যাণ সাধন করার যে প্রবৃত্তি, তা প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করার মাধ্যমে জীবের তৃপ্তি লাভ করার প্রবণতারই আংশিক প্রকাশ।

এই অপূর্ব অনুভূতি ভগবানের আনন্দ বিধান করার মাধ্যমে ব্রজবালারা প্রদর্শন করেছিলেন। কোন কিছু প্রত্যাশা না করেই গোপিকারা ভগবানকে ভালবেসেছিলেন, এবং অকামভাবের এটিই হচ্ছে আদর্শ দৃষ্টান্ত। কামভাব, বা নিজের সন্তুষ্টি বিধানের বাসনা পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় এই জড় জগতে, কিন্তু অকাম ভাব পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় চিজ্জগতে।

ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনা, বা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার বাসনা কামভাবেরই প্রকাশ, কেননা তা জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে নিজের সুখভোগের বাসনারই প্রকাশ। শুদ্ধভক্ত কখনো মুক্তি কামনা করেন না, যার ফলে তিনি জীবনের দুঃখ-দুর্দশা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারেন। তথাকথিত মুক্তি

ব্যতীতই শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের অভিলাষ করেন। কামভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অর্জুন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে প্রথমে যুদ্ধ করতে অসম্মত হয়েছিলেন, কেননা তিনি যাঁর নিজের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধভক্ত হওয়ার ফলে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করে ভগবানের নির্দেশ অনুসারে যুদ্ধ করতে সম্মত হয়েছিলেন, কেননা তিনি প্রকৃতিস্থ হয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে, নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করাই ছিল তাঁর পরম কর্তব্য। এইভাবে তিনি অকাম হয়েছিলেন। সেইটিই হচ্ছে শুদ্ধ জীবের পরম অবস্থা।

উদারধীঃ শব্দটির অর্থ হচ্ছে যাঁর দৃষ্টিভঙ্গী উদার। জড় সুখভোগের আকাঙ্ক্ষী মানুষেরা ক্ষুদ্র দেবতাদের পূজা করে, এবং সেই প্রকার বুদ্ধির নিন্দা করে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/২০) তাদের *হৃতজ্ঞান* বলা হয়েছে, অর্থাৎ যার বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে গেছে। পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত দেবতাদের কাছ থেকে কোন ফল লাভ করা যায় না। তাই উদার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষ বুঝতে পারেন যে, পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা, এমন কি জড়জাগতিক লাভের জন্যও। তাই উদার দৃষ্টিভঙ্গী বা বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষদের কর্তব্য হচ্ছে সর্ব অবস্থাতেই, তা তিনি জড় সুখভোগের আকাঙ্ক্ষীই হোন অথবা মুক্তির আকাঙ্ক্ষীই হোন, সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা। অকাম বা সকাম বা মোক্ষকাম, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে অচিরেই পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনায় যুক্ত হওয়া। এর অর্থ এই যে, যথাযথভাবে ভক্তিযোগের অনুশীলন করার জন্য কর্ম এবং জ্ঞানের মিশ্রণ থেকে মুক্ত হতে হবে। অবিমিশ্রিত সূর্যের কিরণ অত্যন্ত তীব্র, তেমনই অন্তরের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হয়ে সকলেই শ্রবণ, কীর্তন আদি অবিমিশ্রিত ভক্তিযোগ অনুশীলন করতে পারে।

শ্লোক ১১

এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ভাগবতসঙ্গতঃ ॥ ১১ ॥

এতাবান্—এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকার পূজকেরা ; **এব**—নিশ্চিতভাবে ; **যজতাম্**— পূজা করার সময় ; **ইহ**—এই জীবনে ; **নিঃশ্রেয়স**—সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ ; **উদয়ঃ**— বিকাশ ; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানকে ; **অচলঃ**—অবিচলিত ; **ভাবঃ**—স্বতঃস্ফূর্ত ; **যৎ**—যা ; **ভাগবত**—ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ; **সঙ্গতঃ**—সঙ্গ।

অনুবাদ

বিভিন্ন দেবদেবীর পূজকেরা এই পৃথিবীতে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি যে স্বাভাবিক আকর্ষণরূপ অবিচলিত ভক্তি লাভ করেন, তারই ফলে তাঁদের সর্বোত্তম কল্যাণ সাধিত হয়।

তাৎপর্য

দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত এই জড় সৃষ্টিতে সমস্ত জীবেরা জড়া প্রকৃতি বা পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবের দ্বারা আবদ্ধ। জীব তার শুদ্ধ স্বরূপে সচেতন থাকে যে, সে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, কিন্তু জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার বাসনার ফলে সে যখন জড় জগতে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন সে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তার বেঁচে থাকাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ বলে মনে করে এবং বেঁচে থাকার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে। এই জীবন-সংগ্রাম জড় জগতকে ভোগ করার মোহে মরীচিকার পিছনে ধাবিত হওয়ার মতো। জড় সুখভোগের যত পরিকল্পনা, তা এই অধ্যায়ের পূর্বোক্ত শ্লোকগুলিতে বর্ণিত বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনার মাধ্যমেই হোক অথবা ভগবান বা দেবতাদের সাহায্য ব্যতিরেকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নতি সাধনের ফলে হোক, সবই মায়িক। কেননা সুখভোগের এই সমস্ত পরিকল্পনা সত্ত্বেও জীব এই জড় সৃষ্টিতে কখনোই তার জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিরূপ সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারে না। এই ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস এই ধরনের সমস্ত পরিকল্পনাকারীদের কাহিনীতে পূর্ণ, এবং বহু রাজা এবং মহারাজা কালচক্রে আবির্ভূত হয়ে সেই কালচক্রেই মিলিয়ে গেছেন, রেখে গেছেন কেবল তাদের পরিকল্পনার কাহিনী। এই সমস্ত পরিকল্পনাকারীদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জীবনের প্রধান সমস্যাগুলির কোনই সমাধান হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান করা। বিভিন্ন দেবদেবীদের ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে পূজা করে তাদের সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে অথবা ভগবান বা দেবদেবীদের সাহায্য ব্যতিরেকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের তথাকথিত উন্নতি সাধনের মাধ্যমে কখনো এই সমস্ত সমস্যাগুলির সমাধান হয় না।

ঘোর জড়বাদীরা, যারা ভগবান অথবা দেবতাদের মানে না, তাদের ছাড়া অন্য মানুষদের বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বেদ বিভিন্ন দেবদেবীদের পূজা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সমস্ত নির্দেশগুলি ভ্রান্ত বা কল্পনাপ্রসূত নয়। দেবতারা আমাদেরই মতো বাস্তব, তবে ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন বিভাগের পরিচালনা করার দ্বারা সরাসরিভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে তারা অত্যন্ত শক্তিশালী।

এই তত্ত্ব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে। সেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ব্রহ্মা আদি বিভিন্ন দেবতাদের বিভিন্ন লোকের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। ঘোর জড়বাদীরা ভগবান অথবা দেবতাদের অস্তিত্ব বিশ্বাস করে না। এমনকি তারা এও বিশ্বাস করে না যে, বিভিন্ন গ্রহগুলি বিভিন্ন দেবতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তারা সবচাইতে নিকটবর্তী গ্রহ চন্দ্রলোকে গিয়েছে বলে বিরাট কোলাহলের সৃষ্টি করছে বটে ; কিন্তু নানাপ্রকার যান্ত্রিক গবেষণার পরেও তারা চন্দ্রলোক সম্বন্ধে অতি অল্প তথ্যই সংগ্রহ করতে পেরেছে এবং চন্দ্রে জমি বিক্রি করার ব্যাপারে মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিয়ে সেই সমস্ত গর্বান্ধ বৈজ্ঞানিক

অথবা ঘোর জড়বাদীরা সেখানে বসবাস পর্যন্ত করতে পারে না, আর অন্যান্য অসংখ্য গ্রহে প্রবেশ করার কি কথা ; সেগুলি তারা গণনাও পর্যন্ত করতে পারে না।

কিন্তু বেদের অনুগামীদের জ্ঞান অর্জনের বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। তাঁরা বৈদিক শাস্ত্রের সমস্ত বর্ণনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রামাণিক বলে স্বীকার করেন, যে কথা আমরা পূর্বেই প্রথম স্কন্ধে আলোচনা করেছি। তাই ভগবান, দেবতা এবং জড় জগতে অথবা জড় আকাশের ঊর্ধ্বে অবস্থিত বিভিন্ন লোক সম্বন্ধে তাঁদের পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্কাচার্য এবং চৈতন্য মহাপ্রভু প্রমুখ ভারতের সমস্ত মহান আচার্যেরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্র বলে স্বীকার করেছেন। এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাই পাঠ করেছেন, যেখানে দেবতাদের পূজা করার কথা এবং তাদের বিভিন্ন লোকের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/২৫) উল্লেখ করা হয়েছে—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্।।

"বিভিন্ন দেবতাদের পূজকেরা সেই সেই দেবতাদের লোকে গমন করেন, পিতৃপুরুষের পূজকেরা পিতৃলোকে গমন করেন। ঘোর জড়বাদীরা জড় জগতেই অবস্থান করে, কিন্তু ভগবানের ভক্তরা অন্তিমে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হন।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে, এই জড় জগতের সমস্ত গ্রহ, এমনকি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সবই অনিত্য, এবং কোন বিশেষ সময়ে সেগুলি ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রলয়ের সময়ে সমস্ত দেবতা এবং তাঁদের অনুগামীরাও ধ্বংস হয়ে যাবেন, কিন্তু কেউ যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যান, তখন তিনি নিত্য জীবন লাভ করেন। বেদে সে কথাই বলা হয়েছে।

নাস্তিকদের থেকে দেব-দেবীর পূজকদের একটি বাড়তি সুবিধা রয়েছে, এবং তা হচ্ছে বেদের নির্দেশ সম্বন্ধে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকার ফলে তারাএক সময় ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনার সুফল সম্বন্ধে জানতে পারবেন। কিন্তু ঘোর জড়বাদীদের বৈদিক নির্দেশের প্রতি কোনরকম শ্রদ্ধা নেই, তাই তারা সর্বদা অপূর্ণ প্রয়োগাত্মক জ্ঞান বা তথাকথিত ভৌতিক জ্ঞানের ভিত্তিতে ভ্রান্তভাবে পরিচালিত হয়ে পথভ্রষ্ট হয় এবং কখনোই দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না।

তাই যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ভগবানের শুদ্ধভক্তের সান্নিধ্যে না আসে, ততক্ষণ ঘোর জড়বাদী অথবা অনিত্য দেবদেবীর উপাসকদের সমস্ত প্রচেষ্টাই শক্তির অপচয় মাত্র। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের কৃপার ফলেই কেবল শুদ্ধ ভক্তি লাভ করা যায়, যা হচ্ছে মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি।

ভগবানের শুদ্ধ ভক্তই কেবল প্রগতিশীল জীবনের প্রকৃত পথ প্রদর্শন করতে পারেন। তা ছাড়া, ভগবান অথবা দেবতাদের বিষয়ে তত্ত্ববিহীন জীবন অথবা অনিত্য জড় সুখভোগের জন্য বিভিন্ন দেবতাদের পূজায় যুক্ত জীবন, উভয়ই আকাশ-কুসুমের

বিভিন্ন স্তর মাত্র। সেকথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রকৃত জ্ঞান ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ প্রভাবেই কেবল হৃদয়ঙ্গম করা যায়। রাজনৈতিক অথবা শুষ্ক মনোধর্মী দার্শনিকদের বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা কখনোই জানা যায় না।

শ্লোক ১২

জ্ঞানং যদাপ্রতিনিবৃত্তগুণোর্মিচক্র—
মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ
কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্যাৎ॥ ১২॥

জ্ঞানম্—জ্ঞান; **যৎ**—যা; **আ**—পর্যন্ত; **প্রতিনিবৃত্ত**—সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত; **গুণোর্মি**—প্রকৃতির গুণের তরঙ্গ; **চক্রম্**—ঘূর্ণিস্রোত; **আত্মপ্রসাদঃ**—আত্মতৃপ্তি; **উত**—অধিকন্তু; **যত্র**—যেখানে; **গুণেষু**—প্রকৃতির গুণে; **অসঙ্গঃ**—আসক্তিরহিত; **কৈবল্য**—দিব্য; **সম্মত**—স্বীকৃত; **পথঃ**—পথ; **তু**—কিন্তু; **অথ**—অতএব; **ভক্তিযোগঃ**—ভগবদ্ভক্তি; **কঃ**—কে; **নিবৃতঃ**—মগ্ন; **হরিকথাসু**—ভগবানের অপ্রাকৃত কথায়; **রতিম্**—আকর্ষণ; **ন**—না; **কুর্যাৎ**—করে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সম্বন্ধীয় দিব্য জ্ঞান জড়া প্রকৃতির গুণের চক্রকে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত করে। এই জ্ঞান জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে আত্মতৃপ্তি প্রদান করে, এবং অপ্রাকৃত হওয়ার ফলে মহাত্মাগণ কর্তৃক স্বীকৃত। কে এই জ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে থাকতে পারে?

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার (১০/৯) বর্ণনা অনুসারে শুদ্ধ ভক্তদের লক্ষণ অত্যন্ত বিচিত্র। শুদ্ধ ভক্তের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে সর্বক্ষণ পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকা, এবং তার ফলে তাঁরা পরস্পর ভাব বিনিময় করেন এবং দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেন। সদ্গুরুর নির্দেশানুসারে যথাযথভাবে শুদ্ধ ভক্তির অনুশীলন করা হলে সাধন অবস্থাতেও এই দিব্য আনন্দ আস্বাদন করা যায়। উন্নত স্তরে এই অপ্রাকৃত অনুভূতি ভগবানের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কের উপলব্ধিতে পর্যবসিত হয়, যেটি হচ্ছে জীবের প্রকৃত স্বরূপ। ভগবানের সঙ্গে জীবের এই স্বরূপগত সম্পর্ক মধুর রসে ভগবৎ-প্রেম পর্যন্ত বিকশিত হয়, যা হচ্ছে সর্বোত্তম চিন্ময় আনন্দ।

ভগবদুপলব্ধির একমাত্র পন্থা বলে ভক্তিযোগকে বলা হয় *কৈবল্য*। এই সম্পর্কে শ্রীল জীব গোস্বামী বেদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন—*একো নারায়ণো দেবঃ পরাবরাণাং*

পরমাস্তে কৈবল্য-সংজ্ঞিতঃ, এবং এর মাধ্যমে তিনি প্রতিপন্ন করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ কৈবল্য নামে পরিচিত, এবং যে উপায়ে পরমেশ্বর ভগবানের সমীপবর্তী হওয়া যায়, তাকে বলা হয় কৈবল্য পন্থা, বা ভগবানকে পাওয়ার একমাত্র পন্থা।

এই কৈবল্য পন্থার শুরু হয় পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ থেকে, এবং এই প্রকার হরিকথা শ্রবণের ফলে স্বাভাবিকভাবে দিব্য জ্ঞান লাভ হয়, যার ফলে জড় বিষয়ের প্রতি আর কোন আসক্তি থাকে না। তাই ভগবদ্ভক্তের জড় সুখভোগের প্রতি কোনরকম আসক্তি থাকে না। ভগবদ্ভক্ত সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্ত কার্যকলাপের প্রতি অনাসক্ত, এবং উন্নত স্তরে ভগবদ্ভক্ত তাঁর নিজের শরীরের প্রতিও উদাসীন হয়ে পড়েন। অতএব শরীরের সহিত সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনদের কি কথা! ভগবদ্ভক্তির এই স্তরে ভক্ত আর জড়া প্রকৃতির গুণের তরঙ্গের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হন না।

জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ রয়েছে, এবং সমস্ত বৈষয়িক কার্যকলাপ, যার প্রতি সাধারণ মানুষেরা অত্যন্ত আকৃষ্ট, সেই সমস্ত কার্যকলাপের প্রতি ভগবদ্ভক্তের কোন আসক্তি থাকে না। এই অবস্থাকে এখানে *প্রতিনিবৃত্ত গুণোর্মি,* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং সবরকম জড় সম্পর্ক থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত বা *আত্ম প্রসাদ* লাভ করার পন্থা সম্ভব হয়।

উত্তম অধিকারী ভগবদ্ভক্ত ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে এই স্তর প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাঁর অতি উন্নত অবস্থা সত্ত্বেও, পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তিনি স্বেচ্ছায় ভগবানের মহিমা প্রচার কার্যে ব্রতী হন এবং সব কিছুই, এমন কি তাঁর জাগতিক স্বার্থও ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করেন, যাতে নবীন ভক্তরাও তাদের জাগতিক স্বার্থগুলি দিব্য আনন্দে পর্যবসিত করতে পারে।

শ্রীল রূপ গোস্বামী শুদ্ধভক্তের এই আচরণকে *'নির্বন্ধঃ কৃষ্ণ সম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে'* বলে বর্ণনা করেছেন। যদি জাগতিক কার্যকলাপও ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত করা যায়, তা হলে তা-ও দিব্য বা কৈবল্য-ক্রিয়ায় পরিণত হয়।

শ্লোক ১৩

শৌনক উবাচ

ইত্যভিব্যাহৃতং রাজা নিশম্য ভরতর্ষভঃ।
কিমন্যৎপৃষ্টবান্ ভূয়ো বৈয়াসকিমৃষিং কবিম্ ॥ ১৩ ॥

শৌনকঃ উবাচ—শৌনক বললেন ; **ইতি**—এইভাবে ; **অভিব্যাহৃতম্**—যা কিছু বলা হয়েছে ; **রাজা**—রাজা ; **নিশম্য**—শ্রবণ করে ; **ভরত-ঋষভঃ**—মহারাজ পরীক্ষিৎ ; **কিম্**—কি ; **অন্যৎ**—অধিক ; **পৃষ্টবান্**—তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ; **ভূয়ঃ**—পুনরায় ; **বৈয়াসকিম্**—ব্যাসদেবের পুত্রকে ; **ঋষিম্**—অভিজ্ঞ ; **কবিম্**—কাব্যময়।

অনুবাদ

শৌনক বললেন, ব্যাসদেবের পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ছিলেন একজন অতি বিদ্বান ঋষি এবং তিনি কাব্যের আকারে সব কিছু বর্ণনা করতে পারতেন। তাঁর কাছ থেকে এ সব বিষয় শ্রবণ করার পর পরীক্ষিৎ মহারাজ তাঁকে পুনরায় কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

তাৎপর্য

ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সমস্ত দিব্য গুণাবলী আপনা থেকেই বিকশিত হয়, এবং সেই সমস্ত গুণাবলীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হচ্ছে—তিনি দয়ালু, শান্ত, সত্যবাদী, সমদর্শী, ত্রুটিহীন, উদার, মৃদু, শুচি, অনাসক্ত, শুভাকাঙ্ক্ষী, সন্তুষ্ট, শ্রীকৃষ্ণে শরণাগত, লালসা-রহিত, সরল, স্থির, সংযত, মিতভুক, প্রকৃতিস্থ, শিষ্ট, নিরহঙ্কার, গম্ভীর, দয়ালু, মৈত্রীভাবাপন্ন, কবি, দক্ষ এবং মৌন। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ কর্তৃক বর্ণিত ভগবদ্ভক্তের এই ছাব্বিশটি প্রধান গুণের মধ্যে এখানে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সম্বন্ধে কবিত্ব গুণটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করে যেভাবে তা বর্ণনা করেছেন, তা কবিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্দশন। তিনি ছিলেন আত্মতত্ত্ববেত্তা মহর্ষি। অর্থাৎ, তিনি ছিলেন ঋষিদের মধ্যে কবি।

শ্লোক ১৪

এতচ্ছুশ্রূষতাং বিদ্বন্ সূত নোঽর্হসি ভাষিতুম্।
কথা হরিকথোদর্কাঃ সতাং স্যুঃ সদসি ধ্রুবম্ ॥ ১৪ ॥

এতৎ—এই; **শুশ্রূষতাম্**—শ্রবণেচ্ছাকারীদের মধ্যে; **বিদ্বন্**—হে বিদ্বান; **সূত**— সূত গোস্বামী; **নঃ**—আমাদের; **অর্হসি**—আপনি করতে পারেন; **ভাষিতুম্**—ব্যাখ্যা করার জন্য; **কথা**—বিষয়; **হরি-কথা-উদর্কাঃ**—ভগবানের কথায় পর্যবসিত; **সতাম্**—ভক্তদের; **স্যুঃ**—হতে পারে; **সদসি**—সভায়; **ধ্রুবম্**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

হে বিদ্বান সূত গোস্বামী! দয়া করে আপনি আমাদের বলুন তারপর কি হয়েছিল, কেননা আমরা তা শুনতে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী। ভগবদ্ভক্তের সভায় যে কথা হয় তা নিশ্চয়ই হরিকথা ব্যতীত আর কিছু হতে পারে না।

তাৎপর্য

আমরা পূর্বে শ্রীল রূপ গোস্বামীর *ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু* গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করেছি যে, জড় বস্তুও যদি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োগ করা হয়, তা হলে তা অপ্রাকৃত বস্তুতে পর্যবসিত হয়। যেমন, মহাকাব্য বা রামায়ণ এবং মহাভারতের ইতিহাস, যা

অল্পজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য (স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুদের) জন্য রচিত হয়েছিল, তাও বৈদিক শাস্ত্র বলে স্বীকার করা হয়, কেননা তাতে ভগবানের কার্যকলাপ বর্ণিত হয়েছে। মহাভারতকে বলা হয় পঞ্চম বেদ। অন্য চারটি বেদ হচ্ছে সাম, যজুঃ, ঋক্ এবং অথর্ব। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা মহাভারতকে বেদের অংশ বলে স্বীকার করে না, কিন্তু মহর্ষিরা এবং মহাজনেরা তাকে পঞ্চম বেদ বলে স্বীকার করেছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারতের অংশ এবং তাতে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের জন্য ভগবানের পূর্ণ নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা বলতে পারে যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গৃহস্থদের জন্য নয়, কিন্তু সেই সমস্ত মূর্খ মানুষেরা ভেবে দেখে না যে, এই গ্রন্থটি গৃহস্থ লীলাবিলাসকারী ভগবান গৃহস্থ অর্জুনকে বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, যদিও বৈদিক জ্ঞানের সর্বোচ্চ দর্শন বিশ্লেষণ করেছে, তা হচ্ছে অপ্রাকৃত বিজ্ঞানের নবীন অধ্যয়নকারীদের জন্য। আর শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে সেই বিজ্ঞানের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীর অধ্যয়নকারীদের জন্য। তাই মহাভারত, পুরাণ এবং অন্যান্য যে সমস্ত গ্রন্থে ভগবানের লীলা পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে, তা সবই অপ্রাকৃত শাস্ত্র, এবং পূর্ণ শ্রদ্ধা সহকারে মহান ভক্তদের সভায় তা আলোচনা করা উচিত।

এই বিষয়ে সবচাইতে অসুবিধা হল এই যে, এই সমস্ত শাস্ত্র যখন পেশাদারী পাঠকেরা পাঠ করে, তখন তা জাগতিক ইতিহাস বলে মনে হয়, কেননা তাতে বহু ঐতিহাসিক তত্ত্ব রয়েছে। তাই এখানে বলা হয়েছে যে, এই সমস্ত শাস্ত্র ভক্তদের সভায় আলোচনা করা উচিত। ভক্তদের সভায় যদি তা আলোচনা না করা হয়, তা হলে উচ্চস্তরের মানুষেরা তার স্বাদ আস্বাদন করতে পারেন না।

অতএব চরম সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, পরমেশ্বর ভগবান নির্বিশেষ বা নিরাকার নন। তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ, এবং তাঁর বিভিন্ন লীলা রয়েছে। তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম গুরু এবং তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর আত্মমায়ার প্রভাবে এই জগতে অবতরণ করেন বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করার জন্য। তার ফলে তিনি ঠিক একজন সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় নেতার মতো আচরণ করেন। যেহেতু এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা চরমে ভগবানের কথায় পর্যবসিত হয়, তাই সেই সমস্ত বিষয়ের প্রাথমিক আলোচনাগুলিও অপ্রাকৃত। মানব সমাজের সামাজিক কার্যকলাপকে পারমার্থিক স্তরে পর্যবসিত করার এইটিই হচ্ছে পন্থা।

ইতিহাস, গল্প, উপন্যাস, নাটক, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি পাঠ করার স্বাভাবিক প্রবণতা মানুষের রয়েছে। তাই যদি এই প্রবণতাকে ভগবানের সেবায় রূপান্তরিত করা হয়, তা হলে সেগুলি ভগবানের ভক্তদের আস্বাদ্য বিষয়ে পর্যবসিত হবে।

নির্বিশেষবাদের অপপ্রচারের ফলে মানুষ নাস্তিক এবং শ্রদ্ধাহীন অসুরে পরিণত হচ্ছে ; সকলকে শেখানো হচ্ছে যে, ভগবান নিরাকার, তাঁর কোন কার্যকলাপ নেই এবং তিনি নাম-রূপ বিহীন একটি জড় পাথর মাত্র। মানুষ যতই ভগবানের লীলার বিমুখ

হয়, ততই তারা বৈষয়িক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। তার ফলে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে তাদের নরকে যাওয়ার পথ প্রশস্ত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের শুরু হচ্ছে (প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক এবং সামাজিক কার্যকলাপ সমন্বিত) পাণ্ডবদের ইতিহাস থেকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীমদ্ভাগবতকে বলা হয় *পরমহংস-সংহিতা,* বা সর্বোচ্চ স্তরের মহাত্মাদের জন্য বৈদিক শাস্ত্র, এবং তাতে পরম জ্ঞান বা সর্বোচ্চ স্তরের পারমার্থিক জ্ঞান বর্ণিত হয়েছে। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা সকলেই পরমহংস, এবং হংসেরা যেমন জল থেকে দুধ আলাদা করে পান করতে পারে, তাঁরাও সেই রকম সদসদ্দের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম।

শ্লোক ১৫

স বৈ ভাগবতো রাজা পাণ্ডবেয়ো মহারথঃ।
বালক্রীড়নকৈঃ ক্রীড়ন্ কৃষ্ণক্রীড়াং য আদদে ॥ ১৫ ॥

সঃ—তিনি; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **ভাগবতঃ**—ভগবানের মহান্ ভক্ত; **রাজা**—মহারাজ পরীক্ষিৎ; **পাণ্ডবেয়ঃ**—পাণ্ডবদের পৌত্র; **মহারথঃ**—মহান যোদ্ধা; **বাল**—বাল্য অবস্থাতে; **ক্রীড়নকৈঃ**—খেলার পুতুল নিয়ে; **ক্রীড়ন্**—খেলতেন; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ক্রীড়াম্**—কার্যকলাপ; **যঃ**—যিনি; **আদদে**—স্বীকার করেছিলেন।

অনুবাদ

পাণ্ডবদের পৌত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর শৈশব থেকেই একজন মহান্ ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। পুতুল নিয়ে খেলার ছলে তিনি পরিবারের শ্রীবিগ্রহের পূজার অনুকরণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৬/৪১) বর্ণনা করা হয়েছে যে, যোগভ্রষ্ট পুরুষ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের গৃহে অথবা সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয় রাজা বা ধনী বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন তার থেকেও অধিক, কেননা তাঁর পূর্ব জন্ম থেকেই তিনি ছিলেন ভগবানের মহান্ ভক্ত, এবং তাই তিনি কুরু বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বিশেষ করে পাণ্ডবদের বংশে। তাই তাঁর শৈশবের প্রথম থেকেই তাঁর নিজের পরিবারে অন্তরঙ্গভাবে কৃষ্ণভক্তির পন্থা জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

---

* এমন কি পঞ্চাশ বছর আগেও ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থা এত সুসংহত ছিল যে, কেউই ভগবানের লীলা সমন্বিত শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ পাঠ করত না। ভগবদ্ সম্বন্ধ বিহীন অন্য কোন নাটক তারা অভিনয় করত না। ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক বিহীন মেলা বা উৎসব অনুষ্ঠান করত না। এমন কি ভগবানের লীলা বিজড়িত পবিত্র তীর্থ বা ধাম ছাড়া অন্য কোন স্থানে যেত না। তার ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষও, তার শৈশব থেকেই, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করত। কিন্তু কলিযুগের প্রভাবে তারা মানব সমাজকে কুকুর-শূকরের স্তরে অধঃপতিত করেছে এবং পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে কেবল অন্ন বস্ত্রের সংস্থানের জন্য পরিশ্রম করছে।

পাণ্ডবেরা সকলেই ছিলেন ভগবানের ভক্ত, তাই তাঁরা নিশ্চয় রাজপ্রাসাদে পূজিত পরিবারের বিগ্রহের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। এইরকম পরিবারে যে সমস্ত শিশুরা জন্মগ্রহণ করে, তারা সৌভাগ্যবশত শৈশবে শ্রীবিগ্রহের পূজার অনুকরণ করে খেলা করে।

শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আমাদের বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়েছিল, এবং আমাদের শৈশবে আমরা আমাদের পিতৃদেবকে অনুকরণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতাম। আমাদের পিতৃদেব রথযাত্রা, দোলযাত্রা আদি সমস্ত অনুষ্ঠান সর্বতোভাবে পালন করতে অনুপ্রাণিত করতেন, এবং তিনি বহু অর্থ ব্যয় করে মুক্ত হস্তে শিশুদের এবং আত্মীয়-স্বজনদের প্রসাদ বিতরণ করতেন।

আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেবও বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর মহান্ বৈষ্ণব পিতা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কাছ থেকে ভক্তিবিষয়ক সব রকম অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। সমস্ত সৌভাগ্যবান বৈষ্ণব পরিবারে এইটিই হচ্ছে ধারা।

বিখ্যাত মীরাবাঈ ছিলেন গোবর্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণের নিষ্ঠাবতী ভক্ত। এই সমস্ত ভক্তদের ইতিহাস প্রায় একই রকম কেননা ভগবানের সমস্ত বড় বড় ভক্তদের প্রারম্ভিক জীবনে সর্বদা একপ্রকার ঐক্য দেখা যায়।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে পরীক্ষিৎ মহারাজ নিশ্চয়ই বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা শ্রবণ করেছিলেন, কেননা তিনি তাঁর শৈশবে খেলার সাথীদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলার অনুকরণ করতেন। শ্রীধর স্বামীর মতে, মহারাজ পরীক্ষিৎ পরিবারের প্রাপ্তবয়স্কদের শ্রীবিগ্রহের আরাধনার অনুকরণ করতেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও জীব গোস্বামীর মত সমর্থন করেছেন। উভয় মতানুসারেই মহারাজ পরীক্ষিৎ তার শৈশব থেকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিকভাবে অনুরক্ত ছিলেন। তিনি উপরোক্ত দুটি ভাবের যেটিরই অনুকরণ করে থাকুন না কেন, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, তিনি তাঁর শৈশব থেকেই গভীরভাবে ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ ছিলেন, যা হচ্ছে মহাভাগবতের লক্ষণ।

এমন মহাভাগবতদের বলা হয় নিত্য সিদ্ধ, বা জন্ম থেকেই মুক্ত-আত্মা। কিন্তু অন্য অনেকে রয়েছেন যাঁরা জন্ম থেকে মুক্ত পুরুষ নন, কিন্তু সঙ্গ প্রভাবে ভগবদ্ভক্তির পথে অগ্রসর হন। তাঁদের বলা হয় সাধন-সিদ্ধ। চরমে এই দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেবল শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে সকলেই সাধন-সিদ্ধ হতে পারেন। তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছেন আমাদের আচার্য শ্রীনারদ মুনি। তাঁর পূর্ব জন্মে তিনি ছিলেন একজন দাসীর পুত্র, কিন্তু মহাভাগবতদের সঙ্গ প্রভাবে তিনি ভগবদ্ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন, যে দৃষ্টান্ত ভগবদ্ভক্তির ইতিহাসে বিরল।

শ্লোক ১৬

বৈয়াসকিশ্চ ভগবান্ বাসুদেবপরায়ণঃ ।
উরুগায়গুণোদারাঃ সতাং স্যুর্হি সমাগমে ॥ ১৬ ॥

বৈয়াসকিঃ—ব্যাসদেবের পুত্র; **চ**—ও; **ভগবান্**—দিব্য জ্ঞানে পূর্ণ; **বাসুদেব**—শ্রীকৃষ্ণ; **পরায়ণঃ**—আসক্ত; **উরুগায়**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যার মহিমা মহান দার্শনিকেরা কীর্তন করেন; **গুণ-উদারাঃ**—শ্রেষ্ঠ গুণাবলী; **সতাম্**—ভক্তদের; **স্যুঃ**—অবশ্যই হয়েছে; **হি**—নিশ্চয়; **সমাগমে**—উপস্থিতিতে।

অনুবাদ

ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব দিব্য জ্ঞানে পূর্ণ ছিলেন এবং তিনি বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণের মহান্ ভক্ত ছিলেন। অতএব মহান ভক্তদের সমাগমে শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তনরূপ উদার কথাই হয়েছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সতাম্* শব্দটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। *সতাম্* শব্দটির অর্থ— ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য বাসনাশূন্য শুদ্ধভক্ত। এই প্রকার ভক্তসঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণের দিব্য মহিমা যথাযথভাবে আলোচিত হয়। ভগবান বলেছেন যে, তাঁর কথা দিব্য বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ এবং কেউ যখন যথাযথভাবে *সতাম্‌দের* সঙ্গে তাঁর কথা শ্রবণ করেন, তিনি অবশ্যই তার প্রভাব অনুভব করতে পারেন এবং স্বাভাবিকভাবেই ভগবদ্ভক্তির স্তর লাভ করেন। এই সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, তাঁর জন্ম থেকেই মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন ভগবানের একজন মহান্ ভক্ত, তেমনই শুকদেব গোস্বামীও তাঁর জন্মের পূর্ব থেকেই একজন মহান্ ভক্ত ছিলেন। তাঁরা উভয়ই ছিলেন সমপর্যায়ভুক্ত। যদিও মনে হতে পারে যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন রাজকীয় সুযোগ-সুবিধায় অভ্যস্ত একজন সম্রাট, আর শুকদেব গোস্বামী ছিলেন এমনই একজন আদর্শ ত্যাগী যে, তিনি তাঁর অঙ্গে বস্ত্র পর্যন্ত ধারণ করতেন না। আপাতদৃষ্টিতে মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং শুকদেব গোস্বামীকে সম্পূর্ণ বিপরীত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা দুজনেই ছিলেন অনন্য ভক্তিসম্পন্ন ভগবানের শুদ্ধভক্ত। তেমন ভক্তরা যখন একত্রিত হন, তখন ভগবানের মহিমা কীর্তন বা ভক্তিযোগের আলোচনা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের আলোচনা হতে পারে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও, যখন ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্ত অর্জুনের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল, তখনও ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের আলোচনা হতে পারেনি, যদিও তথাকথিত পণ্ডিতেরা তা নিয়ে তাদের নিজস্ব মত অনুসারে নানারকম জল্পনা কল্পনা করে থাকে।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে *বৈয়াসকি* শব্দের পরে *চ* শব্দের ব্যবহার ইঙ্গিত করে যে, শুকদেব গোস্বামী এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ উভয়েই ছিলেন সমপর্যায়ভুক্ত ভগবদ্ভক্ত,

যদিও তাঁদের একজন গুরুর ভূমিকা এবং অপর জন শিষ্যের ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সেই আলোচনার বিষয়, তাই *বাসুদেব-পরায়ণঃ* বা 'বাসুদেবের ভক্ত' উক্তিটি ইঙ্গিত করে যে, তাঁরা উভয়ই ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত। মহারাজ পরীক্ষিৎ যেখানে প্রায়োপবেশন অবলম্বন করেছিলেন, সেখানে যদিও অন্য অনেকে সমবেত হয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের আলোচনা হয়নি; কেননা সেই সভার মুখ্য বক্তা ছিলেন শুকদেব গোস্বামী এবং প্রধান শ্রোতা ছিলেন মহারাজ পরীক্ষিৎ। অতএব ভগবানের দুজন প্রধান ভক্তের দ্বারা কথিত এবং শ্রুত হওয়ার ফলে শ্রীমদ্ভাগবত কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তনেরই নিমিত্ত।

শ্লোক ১৭

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমশ্লোকবার্তয়া ॥ ১৭ ॥

আয়ুঃ—আয়ু; **হরতি**—হরণ করে; **বৈ**—অবশ্যই; **পুংসাম্**—মানুষদের; **উদ্যন্**—উদিত হয়ে; **অস্তম্**—অস্তগত হয়ে; **চ**—ও; **যন্**—ভ্রমণ করে; **অসৌ**—সূর্য; **তস্য**—যিনি ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন; **ঋতে**—বিনা; **যৎ**—যাঁর দ্বারা; **ক্ষণঃ**—সময়; **নীত**—ব্যবহৃত; **উত্তমশ্লোক**—সর্বমঙ্গলময় পরমেশ্বর ভগবান; **বার্তয়া**—বার্তায়।

অনুবাদ

সূর্যদেব প্রতিদিন উদিত ও অস্তগত হয়ে সকলের আয়ু হরণ করেন, কিন্তু যাঁরা সর্বমঙ্গলময় পরমেশ্বর ভগবানের কথা আলোচনা করে তাঁদের সময়ের সদ্ব্যবহার করেন, তাঁদেরই আয়ু কেবল তিনি হরণ করেন না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে পরোক্ষভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, মানব জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে আমাদের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য অতি শীঘ্র ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ হওয়া। কাল এবং জোয়ার-ভাঁটা কারোরই প্রতীক্ষা করে না। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের মাধ্যমে কালের যে গতি, তা ব্যর্থ হবে যদি পারমার্থিক উপলব্ধির উদ্দেশ্যে তার যথাযথ সদ্ব্যবহার না করা হয়। পৃথিবীর সমস্ত স্বর্ণের বিনিময়েও জীবনের অপব্যবহৃত একটি ক্ষণও ফিরে পাওয়া যায় না। এই মনুষ্য জীবন জীবকে এই জন্য প্রদান করা হয় যাতে সে তার চিন্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে এবং তার নিত্য আনন্দের উৎস খুঁজে পেতে পারে। প্রতিটি জীব, বিশেষ করে মানুষ আনন্দের অন্বেষণ করে, কেননা আনন্দ হচ্ছে জীবের প্রকৃতিগত অবস্থা। কিন্তু সে বৃথাই জড় পরিবেশে সেই আনন্দের অন্বেষণ করছে। জীব তার স্বরূপে

পূর্ণতমের একটি চিৎ-স্ফুলিঙ্গ, এবং চিন্ময় কার্যকলাপের মাধ্যমে সে পূর্ণরূপে সেই আনন্দ আস্বাদন করতে পারে। ভগবান হচ্ছেন পূর্ণ চিন্ময়, এবং তাঁর নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর এবং বৈশিষ্ট্য তাঁর থেকে অভিন্ন। কেউ যখন ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে যথাযথভাবে ভগবানের উপরোক্ত শক্তিগুলির মধ্যে যে কোন একটির সংস্পর্শে আসে, তৎক্ষণাৎ তার জন্য সিদ্ধির দ্বার খুলে যায়। শ্রীমদ্ভগদগীতায় (২/৪০) ভগবান সেই সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে বলেছেন—"ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন কখনো ব্যর্থ হয় না, তার স্বল্প আচরণও মানুষকে ভবসাগরের মহা ভয় থেকে উদ্ধার করার পক্ষে যথেষ্ট।" অত্যন্ত শক্তিশালী ওষুধ ধমনীতে প্রবেশ করানোর ফলে যেমন তৎক্ষণাৎ তা সারা শরীরের উপর ক্রিয়া করে, ঠিক তেমনই ভগবানের অপ্রাকৃত কথা শুদ্ধ ভক্তের কর্ণকুহরের মাধ্যমে প্রবিষ্ট হলে তৎক্ষণাৎ কার্যকরী হয়। শ্রবণের দ্বারা অপ্রাকৃত বাণীর উপলব্ধি বলতে পূর্ণ উপলব্ধি বোঝায়, ঠিক যেমন গাছের এক জায়গায় ফল ধরলে বুঝতে হবে গাছের অন্যান্য অংশেও ফল ধরেছে। শুকদেব গোস্বামীর মতো শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে ক্ষণিকের উপলব্ধিও মনুষ্য জীবনকে অমরত্ব প্রদান করে। তার ফলে সূর্য সেই শুদ্ধ ভক্তের আয়ু হরণ করতে পারে না, কেননা ভগবদ্ভক্তিতে নিরন্তর যুক্ত থাকার ফলে তার অস্তিত্ব বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে। মৃত্যু হচ্ছে অমৃতময় জীবের ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থার লক্ষণ; জড় জগতের ভবরোগ নামক সংক্রামক ব্যাধির প্রভাবেই নিত্য জীব জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির কবলগ্রস্ত হয়।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, দান আদি জাগতিক পুণ্য কর্ম অনুষ্ঠানের নির্দেশ স্মৃতি-শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। উপযুক্ত পাত্রে অর্থ দান করা হলে নিঃসন্দেহে পরবর্তী জীবনে তার সুফল পাওয়া যাবে। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই প্রকার দান যেন ব্রাহ্মণকে করা হয়। যদি অব্রাহ্মণকে (ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী বিহীন ব্যক্তিকে) অর্থ দান করা হয়, তা হলে পরবর্তী জীবনে সেই মাত্রায় অর্থ ফিরে পাওয়া যায়। তা যদি অর্ধ শিক্ষিত ব্রাহ্মণকে দান করা হয়, তা হলে দ্বিগুণ মাত্রায় সেই অর্থ ফিরে পাওয়া যায়। বিদ্বান এবং পূর্ণ গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে যদি তা দান করা হয়, তা হলে তা শত-সহস্র গুণে ফিরে পাওয়া যায় এবং সেই অর্থ যদি বেদ-পারগ (যিনি বেদের পন্থা যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছেন) ব্যক্তিকে দান করা হয়, তা হলে তা অনন্ত গুণে বর্ধিত হয়।

বৈদিক জ্ঞানের চরম স্তর হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বগতভাবে জানা, যে কথা শ্রীমদ্ভগবদগীতায় (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্য*) বলা হয়েছে। অর্থদান করা হলে, মাত্রা নির্বিশেষে তা নিশ্চিতভাবে ফিরে পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। তেমনই, শুদ্ধ ভক্তসঙ্গে ভগবানের অপ্রাকৃত কথা শ্রবণ এবং কীর্তনে যদি একটি ক্ষণও যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়, তা হলে নিত্য জীবন লাভ করে জীবের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। *মদ্ধাম গত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে*। অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্ত যে নিত্য জীবন লাভ করবেন, তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া

হয়েছে। ভক্তের বর্তমান জীবনে যে জরা এবং ব্যাধির প্রভাব দেখা যায়, তা প্রকৃতপক্ষে প্রতিশ্রুত নিত্য জীবনের প্রেরণা।

শ্লোক ১৮

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যুত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে ॥ ১৮ ॥

তরবঃ—বৃক্ষ সমূহ; **কিম্**—কি; **ন**—করে না; **জীবন্তি**—জীবন ধারণ; **ভস্ত্রাঃ**—হাপর; **কিম্**—কি; **ন**—করে না; **শ্বসন্তি**—শ্বাস গ্রহণ; **উত**—ও; **ন**—করে না; **খাদন্তি**—খায়; **ন**—করে না; **মেহন্তি**—বীর্যপাত; **কিম্**—কি; **গ্রামে**—স্থানে; **পশবঃ**—পশু; **অপরে**—অন্য।

অনুবাদ

বৃক্ষসমূহ কি বেঁচে থাকে না? কামারের হাপর কি শ্বাসগ্রহণ ও পরিত্যাগ করে না? আমাদের চতুর্দিকে পশুরা কি আহার ও স্ত্রী-সম্ভোগ করে না?

তাৎপর্য

আধুনিক যুগের জড়বাদীরা তর্ক করবে যে, জীবন বা জীবনের একটি অংশেরও উদ্দেশ্য অধ্যাত্মবিদ্যা বা ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক আলোচনার জন্য নয়। তাদের মতে, জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আহার, পান, স্ত্রী-সম্ভোগের মাধ্যমে জীবন উপভোগ করার জন্য দীর্ঘায়ু লাভ করা। আধুনিক যুগের মানুষেরা জড়-বিজ্ঞানের প্রগতির মাধ্যমে চিরকাল বেঁচে থাকতে চায়। দীর্ঘতম আয়ু লাভ করার জন্য তাদের অনেক মূর্খতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত রয়েছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, আহার, স্ত্রী-সম্ভোগ, আসব পান এবং মজা উপভোগ করার ভোগবাদী দর্শনের চরিতার্থতা সাধনের জন্য তথাকথিত অর্থনৈতিক উন্নতি অথবা জড় বিজ্ঞানের প্রগতি জীবনের উদ্দেশ্য নয়। জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হওয়ার জন্য তপস্যা করা, যাতে এই জীবনের অন্তে শাশ্বত জীবনে প্রবেশ করা যায়।

জড়বাদীরা দীর্ঘায়ু লাভ করতে চায়, কেননা পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না। এই জীবনে তারা যতদূর সম্ভব সুখ-সুবিধা লাভ করতে চায়, কেননা তারা মনে করে যে, মৃত্যুর পর আর জীবন নেই। মানবের নিত্য অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং জড়দেহের পরিবর্তন সম্বন্ধে অজ্ঞতা আধুনিক মানব সমাজে এক প্রচণ্ড উৎপাত সৃষ্টি করেছে। তার ফলে বহু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, এবং আধুনিক মানুষের পরিকল্পনাগুলি যত বাড়ছে সেই সমস্ত সমস্যাগুলিও সেই পরিমাণে বাড়ছে। সমস্যাগুলির সমাধানের পরিকল্পনা সমস্যাগুলি আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। মানুষ যদি একশ বছরেরও অধিক আয়ু লাভ করে, তার অর্থ এই নয় যে, তার ফলে মানব সভ্যতার বিকাশ হবে। শ্রীমদ্ভাগবতে

বলা হয়েছে যে, কিছু বৃক্ষ আছে যেগুলি শত সহস্র বছর বেঁচে থাকে। বৃন্দাবনে (ইমলিতলা নামক স্থানে) একটি তেঁতুল গাছ আছে, যা শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিলাসকালে বর্তমান ছিল। কলকাতায় বোটানিকাল গার্ডেনে একটি বটগাছ আছে, যার বয়স পাঁচশ বছরেরও অধিক। পৃথিবীর সর্বত্রই এ রকম বহু বৃক্ষ রয়েছে। অপর পক্ষে আমরা দেখতে পাই, শঙ্করাচার্য প্রকট ছিলেন কেবল বত্রিশ বছরের জন্য, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রকট ছিলেন কেবল আটচল্লিশ বছর। তার অর্থ কি এই যে, উপরোক্ত বৃক্ষগুলি শঙ্করাচার্য বা চৈতন্য মহাপ্রভুর থেকে অধিক মাহাত্ম্যপূর্ণ? আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য ব্যতীত দীর্ঘ জীবনের কোন গুরুত্ব নেই।

অনেকে সন্দেহ পোষণ করে যে, গাছ-পালা যেহেতু শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে না, তাই তাদের প্রাণ নেই। কিন্তু জগদীশ বসু প্রমুখ আধুনিক বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছেন যে গাছ-পালারও জীবন আছে। অতএব শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করাটাই জীবনের প্রকৃত লক্ষণ নয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে কামারের হাপর খুব ভালভাবে শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, হাপরের জীবন আছে। জড়বাদীরা তর্ক করবে যে, মানুষের জীবনের সঙ্গে বৃক্ষের জীবনের তুলনা করা চলে না, কেননা বৃক্ষ সুস্বাদু খাদ্য আহার করে অথবা মৈথুন সুখের মাধ্যমে তাদের জীবন উপভোগ করতে পারে না। তার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমদ্ভাগবত প্রশ্ন করছে, কুকুর, শূকর ইত্যাদি পশুরা কি মানুষদের সঙ্গে এক গ্রামে থেকে আহার এবং মৈথুন সুখ উপভোগ করে না? শ্রীমদ্ভাগবত এই সম্পর্কে "অন্যান্য পশুরা"—এই বিশেষ শব্দ দুটি উল্লেখ করেছে, অর্থাৎ যে সমস্ত মানুষেরা কেবল আহার, শ্বাস গ্রহণ এবং মৈথুনের পরিকল্পনা করে জীবন যাপন করে, তারা প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যরূপী পশু মাত্র। এই প্রকার চাকচিক্যপূর্ণ পশুরা দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত মানব-সমাজের কোন উপকার করতে পারে না। কারণ—পশুরা অনায়াসে অন্য পশুদের ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু সাধারণত কোন উপকার করতে পারে না।

শ্লোক ১৯

শ্ববিড্‌বরাহোষ্ট্রখরৈঃ
সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎ কর্ণপথোপেতো
জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥ ১৯ ॥

শ্ব—কুকুর; **বিড্ বরাহ**—বিষ্ঠাভোজী গ্রাম্য শূকর; **উষ্ট্র**—উট; **খরৈঃ**—গর্দভদের দ্বারা; **সংস্তুতঃ**—পূর্ণরূপে প্রশংসিত; **পুরুষ**—ব্যক্তি; **পশুঃ**—পশু; **ন**—কখনো না; **যৎ**—যার; **কর্ণ**—কান; **পথ**—পথ; **উপেত**—আগত; **জাতু**—কোন সময়; **নাম**—দিব্য নাম; **গদাগ্রজঃ**—সমস্ত অশুভ থেকে উদ্ধারকারী শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

কুকুর, শূকর, উট এবং গর্দভের মতো মানুষেরা তাদেরই প্রশংসা করে, যারা সমস্ত অশুভ থেকে উদ্ধারকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লীলাসমূহ কখনো শ্রবণ করে না।

তাৎপর্য

জনসাধারণ যদি যথাযথভাবে পারমার্থিক মূল্য সমন্বিত উচ্চতর জীবন যাপনের শিক্ষা লাভ না করে, তাহলে তারা পশুদের থেকে কোন মতেই উন্নত নয়, এবং এই শ্লোকে তাদের বিশেষ করে কুকুর, শূকর, উট এবং গর্দভের সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শিক্ষা দিচ্ছে কুকুরোচিত মনোভাব অর্জন করে একজন প্রভুর সেবা স্বীকার করার। তথাকথিত শিক্ষা শেষ করে, তথাকথিত বিদ্বান ব্যক্তি একটি চাকরির আশায় একটি কুকুরের মতো দরখাস্ত হাতে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাকরি খালি নেই বলে তাদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। কুকুর যেমন একটি উপেক্ষিত পশু এবং এক টুকরো রুটির জন্য সে তার প্রভুর দাসত্ব করে, তেমনই সেই সমস্ত মানুষেরা উপযুক্ত পারিশ্রমিক ব্যতীত বিশ্বস্তভাবে তাদের প্রভুর সেবা করে।

যে সমস্ত মানুষের আহার্য সম্বন্ধে কোন বাছ-বিচার নেই এবং যারা সবরকম অখাদ্য খায়, তাদের শূকরের সঙ্গে তুলনা করা হয়। শূকরেরা বিষ্ঠা আহার করতে অত্যন্ত ভালবাসে। অতএব বিষ্ঠা কোন বিশেষ পশুর খাদ্য। এমনকি পাথরও কোন বিশেষ প্রকার পশু বা পাখীর আহার্য। কিন্তু যা ইচ্ছা তাই খাওয়াটা মানুষের ধর্ম নয়। মানুষের খাদ্য হচ্ছে শস্য, শাক-সব্জি, ফলমূল, দুধ, চিনি ইত্যাদি। পশুদের আহার মানুষদের আহার্য নয়। মানুষদের দন্ত-পংক্তি ফল-মূল, শাক-সব্জি ইত্যাদি কাটার জন্য বা চর্বণ করার জন্য বিশেষভাবে গঠিত। যে সমস্ত মানুষ পশুদের খাদ্য আহার না করে থাকতে পারবে না, তাদের জন্য দুটি শ্বপদ-দন্ত দেওয়া হয়েছে। সকলেই জানে যে, একজনের আহার আর একজনের বিষ। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করা। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার (৯/২৬) বর্ণনা অনুসারে ভগবান পত্র, পুষ্প, ফল, জল ইত্যাদি গ্রহণ করেন। বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কোনরকম পশুর আহার ভগবানকে নিবেদন না করতে। তাই মানুষের আহার এক বিশেষ প্রকারের খাদ্য। তথাকথিত ভিটামিন সংগ্রহের জন্য তার পশুদের অনুকরণ করা উচিত নয়। তাই যে মানুষের খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে কোন বাছবিচার নেই, তাকে একটি শূকরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

উট কাঁটা খেতে ভালবাসে। যে মানুষ পারিবারিক সুখ বা তথাকথিত জাগতিক সুখ ভোগ করতে চায়, তাকে একটি উটের সঙ্গে তুলনা করা হয়। জড় সুখ নানারকম কণ্টকে পূর্ণ, তাই মানুষের কর্তব্য জড় জগতের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যথাসম্ভব কল্যাণ সাধনের জন্য বৈদিক বিধি-নিষেধের নির্দেশানুসারে জীবন যাপন করা। জড়

জগতে জীবন ধারণ করাটা এক রকম নিজের রক্ত শোষণ করার মতো। জড় সুখভোগের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে মৈথুন। মৈথুন সুখ উপভোগ নিজের রক্ত শোষণ করারই মতো এবং সে সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করার বিশেষ কিছু নেই। উট যখন কাঁটা চর্বণ করে, তখন সে তার নিজের রক্তই গলাধঃকরণ করে। কাঁটা চর্বণের ফলে তার জিহ্বা ক্ষত বিক্ষত হয়, এবং তার মুখে রক্ত ঝরতে থাকে। সেই রক্ত মিশ্রিত কাঁটা খেয়ে উট মনে করে সেই কাঁটাগুলি কত সুস্বাদু। তেমনই বড় বড় ব্যবসাদার ও শিল্পপতিরা যে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে নানা প্রকার অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে, তা তাদের নিজেদের রক্তমিশ্রিত কর্মের কণ্টকময় ফল ভোগ করার মতো। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে এই সমস্ত অসুস্থ ব্যক্তিদের উটের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

গর্দভ এমনই একটি পশু যে পশুদের মধ্যে সবচাইতে বড় মূর্খ বলে বিদিত। গর্দভ অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে এবং তার নিজের কোন রকম লাভ ছাড়াই বিরাট বিরাট ভারি বোঝা বহন করে।*

গর্দভেরা সাধারণত ধোপার কাজে নিযুক্ত থাকে, যার সামাজিক অবস্থা খুব একটা সম্মানজনক নয়! আর গর্দভের একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে যে, সে গর্দভীর লাথি খেতে খুব অভ্যস্ত। গর্দভ যখন মৈথুন আকাঙ্ক্ষা করে তখন গর্দভী তাকে লাথি মারে, তথাপি

---

* বিশেষ মূল্যবোধ অর্জন করাই মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই জীবনকে বলা হয় *অর্থদম্*, বা মূল্যবোধ প্রদানকারী। আর জীবনের পরম মূল্যবোধ কি ? তা হচ্ছে জীবের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া, যা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৮/১৫) ইঙ্গিত করা হয়েছে। মানুষের স্বার্থের লক্ষ্য হওয়া উচিত ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। গর্দভ তার হিত সম্বন্ধে অবগত নয়, এবং সে কঠোর পরিশ্রম করে কেবল অন্যদের জন্য। যে মানুষ মানব জীবনে লব্ধ তার নিজের হিত বিস্মৃত হয়ে কেবল অন্যদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, তাকে একটি গর্দভের সঙ্গে তুলনা করা হয়। ব্রহ্ম-বৈবর্ত পুরাণে বলা হয়েছে—

অশীতিং চতুরশ্চৈব লক্ষাংস্তাঞ্জীব জাতিষু।
ভ্রমদ্ভিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্যং মানুষ্যং জন্মপর্যায়াৎ ॥
তদপ্যভলতাং জাতঃ তেষাম্ আত্মাভিমানিনাম্।
বরাকাণাম্ অনাশ্রিত্য গোবিন্দচরণদ্বয়ম্ ॥

মানব জীবন এতই মাহাত্ম্যপূর্ণ যে, স্বর্গের দেবতারাও কখনো কখনো এই পৃথিবীতে মনুষ্য জীবন লাভের বাসনা করেন। কেননা মনুষ্য শরীর লাভ করার ফলেই কেবল অনায়াসে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। এই প্রকার মাহাত্ম্যপূর্ণ শরীর লাভ করা সত্ত্বেও কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দের সঙ্গে তার হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা না করে, তা হলে অবশ্যই সে একটি মূর্খ, যে তার প্রকৃত স্বার্থ বিস্মৃত হয়েছে। এই ৮৪,০০,০০০ বিভিন্ন যোনি ক্রমশ ভ্রমণ করার পর এই মনুষ্য শরীর লাভ হয়। আর দুর্ভাগা মানুষ তার স্বার্থ ভুলে গিয়ে অপরকে নেতা সাজিয়ে তাদের রাজনৈতিক উত্থান এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য নানা প্রকার ভ্রমাত্মক কার্যে লিপ্ত হয়। রাজনৈতিক উত্থান এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করার চেষ্টা করাটা ক্ষতিকর নয়, তবে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কখনই বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। এই সমস্ত পরোপকারের কার্য ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। সে কথা যে জানে না, তাকে সেই গাধার সঙ্গে তুলনা করা হয়, যে নিজের বা অন্যের কল্যাণ সাধনের কথা না ভেবে কেবল অপরের জন্য পরিশ্রম করে।

মৈথুন-সুখের জন্য গর্দভ তার পিছন পিছন যায়। তাই স্ত্রৈন ব্যক্তিদের গর্দভের সঙ্গে তুলনা করা হয়। সাধারণ মানুষ অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে, বিশেষ করে এই কলিযুগে। এই যুগে মানুষ ঠেলাগাড়িতে অথবা রিকশায় অত্যন্ত ভারি বোঝা বহন করে গর্দভের কাজে লিপ্ত। মানব সভ্যতার তথাকথিত প্রগতি মানুষকে গর্দভের কাজে লিপ্ত করেছে। বড় বড় কলকারখানায় শ্রমিকেরাও এই প্রকার ভারবাহী কার্যে যুক্ত, এবং দিনের বেলায় কঠোর পরিশ্রম করার পর সেই সমস্ত দুর্ভাগা শ্রমিকেরা কেবল মৈথুন সুখের জন্যই নয়, নানা প্রকার গৃহস্থালী ব্যাপারেও তাদের স্ত্রীর লাথি খায়।

অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে আধ্যাত্মিক চেতনাবিহীন মানুষদের যে কুকুর, শূকর, উট এবং গর্দভের শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে তা মোটেই অত্যুক্তি নয়। এই প্রকার মূর্খ জনসাধারণের নেতারা এই সমস্ত কুকুর-শূকরদের দ্বারা পূজিত হয়ে অত্যন্ত গর্ব অনুভব করতে পারে, কিন্তু সেটি খুব একটা সম্মানজনক নয়। শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কেউ মনুষ্যবেশী এই সমস্ত কুকুর-শূকরদের নেতা হতে পারে, কিন্তু তার যদি কৃষ্ণভাবনামৃত-বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ার অভিরুচি না থাকে, তা হলে সেই সমস্ত নেতারাও এক-একটি পশু ছাড়া আর কিছুই নয়। তাকে একটি শক্তিশালী পশু বা বিশাল পশু বলে বিবেচনা করা যেতে পারে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে, তার নাস্তিক মনোভাবের জন্য তাকে মনুষ্য শ্রেণীভুক্ত করা হয়নি। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কুকুর-শূকরের মতো ব্যক্তিদের ভগবদ্বিহীন এই সমস্ত নেতারা অধিক পরিমাণে পাশবিক গুণসম্পন্ন বড় বড় এক-একটি পশু।

শ্লোক ২০

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ ॥ ২০ ॥

বিলে—সর্পের গর্ত ; **বত**—মতো ; **উরুক্রম**—পরমেশ্বর ভগবান, যাঁর কার্যকলাপ অদ্ভুত ; **বিক্রমান্**—শৌর্য ; **যে**—এই সমস্ত ; **ন**—কখনই না ; **শৃণ্বতঃ**—শ্রবণ করেছে ; **কর্ণপুটে**—কর্ণরন্ধ্রে ; **নরস্য**—মানুষের ; **জিহ্বা**—জিভ ; **অসতী**—অর্থহীন ; **দার্দুরিকা**—ভেকের ; **ইব**—সদৃশ ; **সূত**—হে সূত গোস্বামী ; **ন**—কখনোই না ; **চ**—ও ; **উপগায়তি**—উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করে ; **উরুগায়**—গান করার উপযুক্ত ; **গাথাঃ**—গীত।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি ভগবানের শৌর্য এবং অদ্ভুত কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করেনি এবং ভগবানের গুণগাথা কীর্তন করেনি, তার কর্ণরন্ধ্র সর্পের গর্তের মতো এবং তার জিহ্বা ভেকের জিহ্বার মতো।

তাৎপর্য

ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদিত হয় দেহের প্রতিটি অঙ্গের দ্বারা। এটি হচ্ছে আত্মার চিন্ময় শক্তি ; তাই ভগবদ্ভক্ত সর্বতোভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে দেহের ইন্দ্রিয়গুলি যখন পবিত্র হয়, তখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া যায় এবং সব কটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ভগবানের সেবা সম্পাদন করা যায়। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়গুলি যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনে ব্যবহার করা হয়, ততক্ষণ ইন্দ্রিয়সমূহ এবং তাদের কার্যকলাপ অপবিত্র বা জড় বলে বিবেচনা করা হয়। বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়সমূহ ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের ব্যাপারে যুক্ত হওয়ার পরিবর্তে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। ভগবান সমস্ত ইন্দ্রিয় সমেত পরম ঈশ্বর, আর তাঁর সেবক যারা তাঁরা বিভিন্ন অংশ, তারাও সেই সমস্ত ইন্দ্রিয় সমন্বিত। ভগবৎ-সেবা ইন্দ্রিয়সমূহের সর্বতোভাবে শুদ্ধ উপযোগ, যে কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত হয়েছে। ভগবান পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপদেশ দান করেছিলেন এবং অর্জুন পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেগুলি গ্রহণ করেছিলেন, এবং তার ফলে গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে পূর্ণ অর্থ সমন্বিত এবং যুক্তিসঙ্গত জ্ঞানের আদর্শ বিনিময় হয়েছিল। গুরুদেব পারমার্থিক জ্ঞান শিষ্যকে বৈদ্যুতিক আবেশের মতো দেন না, যা মূর্খ প্রচারকেরা অনেক সময় অজ্ঞতাবশত দাবী করে। সবকিছু অর্থবহ এবং যুক্তিসঙ্গত, এবং গুরু ও শিষ্যের মধ্যে বিচারের আদান-প্রদান তখনই সম্ভব হয় যখন শিষ্য বিনীতভাবে সেই যথার্থ জ্ঞান গ্রহণে আগ্রহী হয়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা বুদ্ধিমত্তা এবং পূর্ণ বিচার সহকারে গ্রহণ করা উচিত, যাতে তাঁর মহান্ উদ্দেশ্য যুক্তিসঙ্গতভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

কলুষিত অবস্থায় জীবের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদা জড়জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকে। কর্ণ যদি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অথবা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার মাধ্যমে ভগবানের সেবায় যুক্ত না হয়, তা হলে তা অবশ্যই আবর্জনার দ্বারা পূর্ণ হবে। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী উদাত্ত কণ্ঠে পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার করা উচিত। যে শুদ্ধ ভক্ত যথার্থ সূত্রে তা শ্রবণ করেছেন, তাঁর একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে সেই বাণী প্রচার করা। সকলেই প্রায় অন্যদের কিছু বলতে চায়, কিন্তু যেহেতু তারা বৈদিক জ্ঞান সম্বন্ধে কথা বলার শিক্ষা লাভ করেনি, তাই তারা নানা প্রকার অর্থহীন বিষয় নিয়ে কথা বলছে এবং অন্য মানুষেরাও তা গ্রহণ করছে। জাগতিক খবর বিতরণ করার হাজার উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং সারা পৃথিবীর মানুষ তা গ্রহণও করেছে। তেমনই, পৃথিবীর মানুষকে শিক্ষা দেওয়া উচিত কিভাবে ভগবান সম্বন্ধীয় দিব্য জ্ঞান শ্রবণ করতে হয়, এবং ভগবদ্ভক্তদের কর্তব্য হচ্ছে উদাত্ত কণ্ঠে সেই বাণী প্রচার করা যাতে তারা তা শুনতে পায়। ভেক বা ব্যাঙ উচ্চৈঃস্বরে কলরব করে এবং তার ফলে গ্রাসকারী সর্পকে সে আমন্ত্রণ জানায়। মানুষকে তার জিহ্বা দেওয়া হয়েছে

বিশেষভাবে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করার জন্য, ব্যাঙের মতো কোলাহল করার জন্য নয়। এই শ্লোকে *অসতী* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *অসতী* মানে হচ্ছে যে স্ত্রী বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করেছে। বেশ্যার মধ্যে সৎ স্ত্রীসুলভ গুণাবলী থাকে না। তেমনই, যে জিহ্বা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করার জন্য মানুষকে দেওয়া হয়েছিল তা যদি অর্থহীন জাগতিক বিষয়ের গুণগানে মুখর হয়, তা হলে তাকে বেশ্যা বলেই বিবেচনা করা হয়।

শ্লোক ২১

ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্ট-
মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্।
শাবৌ করৌ নো কুরুতে সপর্যাং
হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা ॥ ২১ ॥

ভারঃ—মস্ত বড় বোঝা ; **পরম্**—ভারী ; **পট্ট**—রেশম ; **কিরীট**—উষ্ণীষ ; **জুষ্টম্**—সজ্জিত ; **অপি**—এমনকি ; **উত্তম**—উৎকৃষ্ট ; **অঙ্গম্**—অঙ্গ ; **ন**—কখনোই না ; **নমেৎ**—প্রণতি ; **মুকুন্দম্**—মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণকে ; **শাবৌ**—মৃতদেহ ; **করৌ**—হস্তদ্বয় ; **নো**—করে না ; **কুরুতে**—করা ; **সপর্যাম্**—পূজা ; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের ; **লসৎ**—উজ্জ্বল ; **কাঞ্চন**—সোনা দিয়ে তৈরী ; **কঙ্কণৌ**—কঙ্কণদ্বয় ; **বা**—যদ্যপি।

অনুবাদ

রেশমের উষ্ণীষ এবং কিরীটির দ্বারা মস্তক শোভিত থাকলেও তা যদি মুক্তিদাতা ভগবানের শ্রীচরণে প্রণত না হয়, তবে তা কেবল অত্যন্ত ভারী একটি বোঝার মতো। আর যে হস্তদ্বয় উজ্জ্বল সুবর্ণ কঙ্কণের দ্বারা অলঙ্কৃত, তা যদি ভগবান শ্রীহরির সেবায় যুক্ত না হয়, তা হলে তা শবের হস্তের মতো।

তাৎপর্য

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্ত তিন প্রকার। প্রথম শ্রেণীর ভক্ত বা উত্তম অধিকারী ভক্তের দৃষ্টিতে সকলেই ভগবানের সেবায় যুক্ত, কিন্তু মধ্যম অধিকারী ভক্ত, ভক্ত এবং অভক্তের পার্থক্য বিচার করেন। তাই মধ্যম অধিকারী ভক্ত প্রচার কার্যে যুক্ত হন, এবং উপরোক্ত শ্লোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে মুক্ত কণ্ঠে ভগবানের মহিমা প্রচার করা। মধ্যম অধিকারী ভক্ত কনিষ্ঠ ভক্ত বা অভক্তদের শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। কখনো কখনো উত্তম অধিকারী ভক্ত প্রচারের জন্য মধ্যম অধিকারীর স্তরে নেমে আসেন। কিন্তু এখানে সাধারণ মানুষদের, যাঁরা অন্তত কনিষ্ঠ ভক্ত হবেন বলে আশা করা হয়, তাঁদের এখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁরা যেন ভগবানের মন্দিরে গিয়ে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে প্রণতি নিবেদন করেন।এমনকি অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি অথবা রেশমের উষ্ণীষ বা কিরীট শোভিত রাজাদের পর্যন্ত তা করা কর্তব্য।

ভগবান হচ্ছেন সকলেরই প্রভু, এমনকি তিনি মহান্ রাজা এবং সম্রাটদেরও প্রভু। তাই জনসাধারণের বিচারে যাঁরা অত্যন্ত ধনবান, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে নিয়মিতভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে গিয়ে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে প্রণতি নিবেদন করা। মন্দিরে ভগবানের অর্চা-বিগ্রহকে কখনোই পাথর অথবা কাঠ দিয়েতৈরী বলে মনে করা উচিত নয়, কেননা পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অর্চা-বিগ্রহরূপে প্রকাশিত হয়ে অধঃপতিত জীবদের তাঁর অসীম করুণা প্রদর্শন করছেন। শ্রবণের মাধ্যমে, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, মন্দিরে ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের প্রথম বিধিটি হচ্ছে শ্রবণ। সকল শ্রেণীর ভক্তদেরই শ্রীমদ্ভগবদগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রমুখ প্রামাণিক শাস্ত্র থেকে শ্রবণ করা অবশ্য কর্তব্য। যে সমস্ত মানুষ তাদের জাগতিক ঐশ্বর্যের গর্বে গর্বিত হয়ে ভগবানের মন্দিরে তাঁর শ্রীবিগ্রহকে প্রণতি নিবেদন করে না, অথবা ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু না জেনে মন্দিরে ভগবানের পূজার নিন্দা করে, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তাদের উষ্ণীষ অথবা কিরীট কেবল তাদের ভবসমুদ্রে নিমজ্জিত হতে সাহায্য করবে। তবে ভারী বোঝা সমেত নিমজ্জমান ব্যক্তি বোঝাবিহীন ব্যক্তির থেকে অধিক দ্রুতগতিতে নিমজ্জিত হয়। মূর্খ মদমত্ত মানুষেরা ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞান অস্বীকার করে ঘোষণা করে যে, ভগবান বলে কেউ নেই। কিন্তু তারা যখন ভগবানের আইনের কবলিত হয়ে নানাপ্রকার দুরারোগ্য ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন তারা তাদের জাগতিক সম্পদের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে অবিদ্যার সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। ভগবচ্চেতনাবিহীন ভৌতিক বিজ্ঞানের প্রগতি মানব সমাজের মস্তকে একটি ভারী বোঝার মতো, তাই এই মহান সতর্কবাণী সম্বন্ধে সচেতন হওয়া উচিত।

সাধারণ মানুষের যদি ভগবানের পূজা করার সময় না থাকে, তা হলে অন্তত অল্প কিছুক্ষণের জন্য হলেও তারা হাত দিয়ে ভগবানের মন্দির পরিষ্কার করতে পারে অথবা ঝাড়ু দিতে পারে। উড়িষ্যার অত্যন্ত প্রতাপশালী রাজা মহারাজ প্রতাপরুদ্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্যে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও জগন্নাথ পুরীতে রথযাত্রার সময় প্রতি বৎসর শ্রীজগন্নাথের মন্দির ঝাড়ু দিতেন। সকলেরই কর্তব্য, তা তিনি যত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিই হোন না কেন, পরমেশ্বর ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা। জগন্নাথের আনুগত্যের ফলে মহারাজ প্রতাপরুদ্র এমনই শক্তিশালী রাজা হয়েছিলেন যে, সেই সময়ের অত্যন্ত পরাক্রমশালী পাঠান রাজা উড়িষ্যাতে প্রবেশ করতে পারেনি। অবশেষে মহারাজ প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেছিলেন। জগন্নাথের প্রতি তাঁর আনুগত্য দর্শন করার ফলেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এইভাবে তাঁকে কৃপা করেন। ধনী ব্যক্তির গৃহিণীর হস্ত মূল্যবান কঙ্কণ ও বলয় দ্বারা অলঙ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেবায় তাদের হস্তগুলিকে নিযুক্ত করা।

শ্লোক ২২

বর্হায়িতে নয়নে নরাণাং
লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।

পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ ॥ ২২ ॥

বর্হায়িতে—ময়ূরের পালকের মতো ; **তে**—তারা ; **নয়নে**—আঁখি ; **নরাণাম্**—মানুষদের ; **লিঙ্গানি**—রূপ ; **বিষ্ণোঃ**—পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর ; **ন**—করে না ; **নিরীক্ষতঃ**—দর্শন করে ; **যে**—এই সমস্ত ; **পাদৌ**—পদ ; **নৃণাম্**—মানুষদের ; **তৌ**—তারা ; **দ্রুমজন্ম**—বৃক্ষজাত ; **ভাজৌ**—সদৃশ ; **ক্ষেত্রাণি**—পবিত্র স্থান ; **ন**—কখনই না ; **অনুব্রজতঃ**—পরিভ্রমণ ; **হরেঃ**—ভগবানের ; **যৌ**—যা।

অনুবাদ

যে নয়ন শ্রীবিষ্ণুর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে না তা ময়ূর পুচ্ছে অঙ্কিত চক্ষুর মতো, এবং যে পদ পরমেশ্বর ভগবানের লীলাভূমি বা তীর্থসমূহে বিচরণ করে না তা বৃক্ষের মতো স্থাবর।

তাৎপর্য

বিশেষ করে গৃহস্থ ভক্তদের জন্য অর্চা-বিগ্রহের পূজা করার পন্থা অনুমোদন করা হয়েছে। যতদূর সম্ভব প্রতিটি গৃহস্থের কর্তব্য শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণ অথবা সীতা-রামের, অথবা নৃসিংহ, বরাহ, গৌর-নিতাই, মৎস্য, কূর্ম, শালগ্রাম বা বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম, কেশব, অচ্যুত, বাসুদেব, নারায়ণ, দামোদর আদি বৈষ্ণব-তন্ত্র বা পুরাণে বর্ণিত ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে নিষ্ঠা সহকারে অর্চন-বিধি পালনপূর্বক সপরিবারে সেই বিগ্রহের পূজা করা। বার বছর বা বেশি বয়ঃপ্রাপ্ত পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সদ্‌গুরু কর্তৃক দীক্ষিত হওয়া উচিত, এবং ভোর চারটা থেকে শুরু করে রাত দশটা পর্যন্ত মঙ্গল-আরাত্রিক, নিরঞ্জন, অর্চন, পূজা, কীর্তন, শৃঙ্গার, বৈকালিক-ভোগ, সন্ধ্যা-আরাত্রিক, পাঠ, সান্ধ্য-ভোগ, শয়ন-আরাত্রিক ইত্যাদি ভগবানের দৈনন্দিন সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত। সদ্‌গুরুর নির্দেশনায় এইভাবে ভগবানের অর্চা-বিগ্রহের আরাধনায় যুক্ত হওয়ার ফলে গৃহস্থ ভক্ত অনায়াসে পবিত্র হতে পারবে এবং অতি দ্রুত পারমার্থিক উন্নতি সাধন করবে। পুঁথিগত জ্ঞান কেবল ধারণাগত, কিন্তু অর্চনের পন্থা ব্যবহারিক। ধারণাগত এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয়ের মাধ্যমে পারমার্থিক উন্নতি সাধিত হয়। কনিষ্ঠ ভক্তের ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে সুদক্ষ গুরুর উপর, যিনি জানেন কিভাবে তাঁর শিষ্যকে ধীরে ধীরে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য অর্থ উপার্জনের মানসে কপটতাপূর্বক গুরুগিরি করা উচিত নয় ; পক্ষান্তরে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে শিষ্যকে উদ্ধার করার জন্য গুরু হওয়ার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। সদ্‌গুরুর গুণাবলী বর্ণনা করে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর গুর্বাষ্টক রচনা করেন। তার একটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে—

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা
শৃঙ্গার-তন্মন্দির-মার্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

শ্রীবিগ্রহ হচ্ছেন ভগবানের পূজনীয় অর্চাবিগ্রহ, এবং শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে নিয়মিতভাবে সেই বিগ্রহকে শৃঙ্গার করার মাধ্যমে, মন্দির মার্জন করার মাধ্যমে তাঁর আরাধনায় যুক্ত হওয়া। সদ্‌গুরু কৃপা করে নবীন ভক্তকে স্বয়ং এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেন এবং ভগবানের দিব্য নাম, গুণ, রূপ ইত্যাদি উপলব্ধি করতে সাহায্য করেন।

কেবল নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে, বিশেষ করে ভগবানের শৃঙ্গার মন্দির সজ্জা, কীর্তন এবং শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করার মাধ্যমে পারমার্থিক উপদেশ অর্জনপূর্বক নিয়মিতভাবে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করার ফলে সাধারণ মানুষ নারকীয় সিনেমার আকর্ষণ এবং বেতারে পরিবেশিত জঘন্য আধুনিক গানের আকর্ষণ থেকে রক্ষা পেতে পারে। কেউ যদি বাড়িতে মন্দির প্রতিষ্ঠা না করতে পারে, তা হলে তার উচিত যে সমস্ত মন্দিরে নিয়মিতভাবে উপরোক্ত অনুষ্ঠানগুলি পালন করা হয় সেখানে যাওয়া। মন্দিরে গিয়ে পবিত্র পরিবেশে সুন্দর শৃঙ্গারে সজ্জিত ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করার ফলে বিষয়াসক্ত মন স্বাভাবিক ভাবেই চিন্ময় চেতনায় অনুপ্রাণিত হবে। মানুষের কর্তব্য বৃন্দাবন আদি ধামে যাওয়া যেখানে এই রকম মন্দিরে বিশেষভাবে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা হয়। পুরাকালে রাজা-মহারাজা এবং ধনী বণিকেরা ষড় গোস্বামীর মতো ভগবানের সুদক্ষ ভক্তদের নির্দেশনায় এই প্রকার মন্দির নির্মাণ করতেন। সাধারণ মানুষের কর্তব্য হচ্ছে মহান্ ভক্তদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে (*অনুব্রজ*) পবিত্র ধামে তীর্থ করতে গিয়ে এই সমস্ত মন্দিরে এবং সেখানে অনুষ্ঠিত মহোৎসবে যোগদান করার মাধ্যমে সেই সুযোগের যথার্থ সদ্ব্যবহার করা। এই সমস্ত পবিত্র তীর্থে কেবল ভ্রমণের মনোভাব নিয়ে যাওয়া উচিত নয়, পক্ষান্তরে ভগবানের দিব্য লীলা অনুষ্ঠানের ফলে অমর হয়ে রয়েছে বলে জেনে এবং ভগবত্তত্ত্ব ব্যক্তির নির্দেশনায় এই সমস্ত স্থান দর্শন করতে হয়। তাকে বলা হয় *অনুব্রজ*। *অনু* মানে অনুসরণ করা। তাই শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুসরণ করা, এমন কি মন্দির দর্শন এবং তীর্থপর্যটনের ক্ষেত্রেও। যে ব্যক্তি এইভাবে বিচরণ না করে, সে একটি জড় বৃক্ষের মতো, যাকে ভগবান চলচ্ছক্তির ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করেছেন। কেবল প্রাকৃত দৃশ্য দর্শন করার জন্য ভ্রমণ করা হলে মানুষের চলচ্ছক্তির অপব্যবহার হয়। ভ্রমণের প্রবণতার সবচাইতে সুন্দর সদ্ব্যবহার হয় মহান্ আচার্যদের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন পবিত্র স্থান ভ্রমণের ফলে, এবং তা হলে পারমার্থিক জ্ঞান রহিত ধন উপার্জনের আকাঙ্ক্ষী নাস্তিকদের অপপ্রচারের দ্বারা বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

শ্লোক ২৩

জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুং
ন জাতু মর্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ
শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্ ॥ ২৩ ॥

জীবন—জীবিত অবস্থায়; **শবঃ**—মৃতদেহ; **ভাগতাঙ্ঘ্রিরেণুম্**—ভগবানের শুদ্ধভক্তের চরণরেণু; **ন**—কখনই না; **জাতু**—কোন সময়; **মর্তাঃ**—মরণশীল; **অভিলভেত**—বিশেষভাবে প্রাপ্ত; **যঃ**—যে ব্যক্তি; **তু**—কিন্তু; **শ্রী**—ঐশ্বর্যসহ; **বিষ্ণুপদ্যা**—শ্রীবিষ্ণুর চরণ কমলের; **মনুজঃ**—মনুর বংশধর (মানব); **তুলস্যাঃ**—তুলসীদল; **শ্বসন্**—শ্বাস গ্রহণ করলেও; **শবঃ**—মৃত শরীর; **যঃ**—যে; **তু**—কিন্তু; **ন বেদ**—জানে না; **গন্ধম্**—সুগন্ধ।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি কখনো তার মস্তকে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের চরণরেণু ধারণ করেনি, সে জীবিত থাকলেও তার দেহটি মৃত। আর যে ব্যক্তি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের তুলসীদলের সুগন্ধ আঘ্রাণ করেনি, সে শ্বাস গ্রহণ করলেও তার দেহটি মৃত।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে যে মৃতদেহ শ্বাস গ্রহণ করে তা হচ্ছে প্রেতাত্মা। কেউ যখন দেহত্যাগ করে, তখন তাকে বলা হয় মৃত, কিন্তু সে যদি পুনরায় আমাদের দৃষ্টির অগোচরে সূক্ষ্মদেহে আবির্ভূত হয় এবং নানারকম কার্যকলাপ করতে থাকে, তখন তাকে বলা হয় প্রেতাত্মা। ভূত বা প্রেতেরা অত্যন্ত খারাপ বস্তু, এবং তারা সর্বদাই ভীতিজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। তেমনই, ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত এবং মন্দিরে বিষ্ণু-বিগ্রহের প্রতি শ্রদ্ধাহীন প্রেতবৎ অভক্তেরা সর্বদাই ভক্তদের জন্য ভীতিজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। এই প্রকার অপবিত্র প্রেতাত্মাদের নিবেদন ভগবান কখনো গ্রহণ করেন না। একটি প্রবাদ আছে যে, প্রিয়তমার প্রতি প্রেমভাব প্রদর্শন করার পূর্বে তার কুকুরের প্রতি প্রেম প্রদর্শন করতে হয়। নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবা করার ফলে শুদ্ধ ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই ভগবদ্ভক্তির প্রথম শর্ত হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের সেবক হওয়া এবং তার সার্থকতা ব্যক্ত করে বলা হয়, "শুদ্ধ ভক্তের সেবা করেছেন যে শুদ্ধ ভক্ত তাঁর চরণরেণু গ্রহণ করা।" সেইটিই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের পরম্পরা।

মহারাজ রহূগণ মহাভাগবত জড়ভরতকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কিভাবে তিনি পরমহংসের মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং তার উত্তরে সেই মহাত্মা বলেছিলেন—

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্বপনাদ্ গৃহাদ্বা।
নচ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নি সূর্যৈর
বিনা মহৎ পাদরজোঽভিষেসম্ ॥ ২৩ ॥ *(ভাঃ ৫/১২/১২)*

"হে মহারাজ রহূগণ, মহান্ ভগবদ্ভক্তের পদরজের দ্বারা অভিষিক্ত না হলে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির স্তর বা পরমহংস স্তর লাভ করা যায় না। তপস্যা, বৈদিক প্রথায় পূজা-অর্চনা, সন্ন্যাস গ্রহণ, গৃহস্থ আশ্রমের কর্তব্য পালন, বৈদিক মন্ত্র পাঠ, অথবা প্রচণ্ড সূর্য কিরণে বা শীতল জলের ভিতর অথবা জ্বলন্ত অগ্নির সম্মুখে কৃচ্ছ্রসাধন করার মাধ্যমে তা লাভ করা যায় না।"

পক্ষান্তরে বলা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তাঁর শুদ্ধ ভক্তের সম্পত্তি, এবং শুদ্ধ ভক্তই কেবল অন্য ভক্তদের সেই শ্রীকৃষ্ণকে দিতে পারেন। কৃষ্ণকে কখনো সরাসরিভাবে পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই *গোপীভর্তুঃ পদকময়োর্দাসদাসানুদাসঃ,* বা "ব্রজগোপিকাদের পালন কর্তা শ্রীকৃষ্ণের দাসের অনুদাসের দাস" বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। ভগবানের শুদ্ধভক্ত তাই কখনো সরাসরিভাবে ভগবানের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেন না, পক্ষান্তরে তিনি ভগবানের দাসের অনুদাসের সন্তুষ্টিবিধান করার চেষ্টা করেন, এবং তার ফলে ভগবান তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন, এবং তখনই কেবল ভক্ত ভগবানের শ্রীচরণের তুলসীদলের সুগন্ধ আঘ্রাণ করে আনন্দিত হন। ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে যে, বৈদিক শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করার মাধ্যমে ভগবানকে পাওয়া যায় না, কিন্তু তাঁর শুদ্ধ ভক্তের মাধ্যমে—তাঁর কাছে যাওয়া যায়। বৃন্দাবনে সমস্ত শুদ্ধ ভক্তেরা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়িনী শক্তি শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপাভিক্ষা করেন। শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন পরম পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের কোমলহৃদয়া অর্ধাঙ্গিনী। তিনি সারা জগতের স্ত্রীরূপা প্রকৃতির সিদ্ধ অবস্থার অনুরূপা। তাই নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্ত অনায়াসে শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপা লাভ করতে পারেন, এবং তিনি যদি একবার শ্রীকৃষ্ণের কাছে সেই ভক্তের জন্য অনুমোদন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাকে তাঁর সঙ্গী করে নেন। তাই যথার্থ সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, সরাসরিভাবে ভগবানের কাছে যাওয়ার চেষ্টা না করে ভগবদ্ভক্তের কৃপা লাভের জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হতে হয়, এবং তার ফলে (ভগবানের ভক্তের শুভেচ্ছার প্রভাবে) ভগবানের সেবা করার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ পুনরায় জাগরিত হবে।

শ্লোক ২৪

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্‌গৃহ্যমানৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥ ২৪ ॥

তৎ—তা ; **অশ্ম-সারম্**—ইস্পাতের আবরণে আচ্ছাদিত ; **হৃদয়ম্**—হৃদয় ; **বতেদম্**—নিশ্চিতরূপে সেই ; **যৎ**—যা ; **গৃহ্যমাণৈঃ**—গ্রহণ করা সত্ত্বেও ; **হরিনাম**—ভগবানের পবিত্র নাম ; **ধেয়ৈ**—মনের একাগ্রতার দ্বারা ; **ন**—করে না ; **বিক্রিয়েত**—পরিবর্তন ; **অথ**—সেইভাবে ; **যদা**—যখন ; **বিকারঃ**—প্রতিক্রিয়া ; **নেত্রে**—নয়নে ; **জলম্**—অশ্রু ; **গাত্ররুহেষু**—লোমকূপে ; **হর্ষঃ**—উল্লাসের প্রস্ফুটন।

অনুবাদ

হরিনাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও যার হৃদয় দ্রবীভূত হয় না, নেত্র অশ্রুপূর্ণ হয় না এবং লোমসমূহ আনন্দে পুলকিত হয় না, তার হৃদয় অবশ্যই ইস্পাতের আবরণে আচ্ছাদিত।

তাৎপর্য

আমরা দেখতে পাই যে, শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে ভগবদ্ভক্তির ক্রমবিকাশ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে শ্রবণ এবং কীর্তনের মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তির প্রথম স্তর বর্ণনা করা হয়েছে, এবং নবীন ভক্তদের জন্য ভগবানের বিশ্বরূপের মাধ্যমে ভগবানের স্থূল ধারণা প্রদান করা হয়েছে। ভগবানের শক্তির ভৌতিক প্রকাশের মাধ্যমে মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে চিন্ময় স্তরে উন্নীত করা যায় এবং ধীরে ধীরে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ধ্যানে মনকে মগ্ন করা যায়, যিনি পরমাত্মারূপে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র প্রতিটি জীবের হৃদয়ে এবং প্রতিটি পরমাণুতে বিরাজমান। সাধারণ মানুষের পাঁচ প্রকার মনোবৃত্তির জন্য যে পঞ্চ উপাসনার পদ্ধতি রয়েছে তাও এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতরের পূজা করার ক্রমোন্নতির পদ্ধতি, যেমন অগ্নি, বিদ্যুৎ, সূর্য, সমগ্র জীবসত্তা, শিব এবং অবশেষে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আংশিক অভিব্যক্তি নির্বিশেষ পরমাত্মা। সে সব অত্যন্ত সুন্দরভাবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়ে ক্রমোন্নতির পরবর্তী পর্যায় বর্ণিত হয়েছে তাঁদের জন্য, যাঁরা যথার্থই শ্রীবিষ্ণুর আরাধনার স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন বা শুদ্ধভক্তি লাভ করেছেন ; এবং এখানে বিষ্ণুপূজার পরিপক্ক অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে যার ফলে হৃদয়ের পরিবর্তন হয়।

পারমার্থিক সংস্কৃতির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবের হৃদয়ের পরিবর্তন সাধন করা যার ফলে সে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সেবকরূপে তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। তাই ভগবদ্ভক্তির প্রগতির ফলে হৃদয়ে যে পরিবর্তন হয় তার প্রকাশ হয় ধীরে ধীরে জড় জগতের উপর আধিপত্য করার প্রবণতা প্রসূত ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি বিরক্তি এবং ভগবানের প্রেমময়ী সেবার প্রতি আসক্তির মাধ্যমে। বিধি-ভক্তি বা দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা (যথা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ, যা পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে) সাধিত ভক্তি এখানে এখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যকলাপের প্রেরণা প্রদানকারী মনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বতোভাবে আশা করা হয় যে,

বৈধী-ভক্তি অনুশীলনের ফলে অবশ্যই হৃদয়ের পরিবর্তন হবে। সেরকম পরিবর্তন যদি না হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, সেই হৃদয় কঠিন ইস্পাতে গাঁথা, কেননা ভগবানের পবিত্র নাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও তা দ্রবীভূত হল না। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনে শ্রবণ এবং কীর্তন হচ্ছে সব চেয়ে মুখ্য অঙ্গ, এবং তা যদি যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তা হলে অশ্রু, পুলক আদি লক্ষণ সমন্বিত অপ্রাকৃত আনন্দের উপলব্ধি হবে। এইগুলি ভগবৎ-প্রেমের পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে ভাব-স্তরের প্রাথমিক লক্ষণ, যা স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশিত হয়।

ভগবানের দিব্য নাম নিরন্তর শ্রবণ এবং কীর্তন করার ফলেও যদি এই ধরনের প্রতিক্রিয়া না হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, নাম-অপরাধ হচ্ছে। এটি সন্দর্ভের সিদ্ধান্ত। ভগবানের নাম গ্রহণের প্রাথমিক অবস্থায় দশটি অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে ভক্ত যদি বিশেষভাবে সতর্ক না হন, তা হলে অশ্রু, পুলক আদি লক্ষণের মাধ্যমে ভগবৎ-বিরহের প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে না।

ভাব-স্তরের প্রকাশ হয় আটটি অপ্রাকৃত লক্ষণের মাধ্যমে। যথা—*জাড্য, স্বেদ, পুলক, গদগদ, কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু,* এবং অবশেষে *সমাধি*। শ্রীল রূপ গোস্বামীর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* নামক গ্রন্থে এই সমস্ত অপ্রাকৃত লক্ষণ এবং *স্থায়ী* ও *সঞ্চারী ভাবের* বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে।

কিছু দুরাচারী কনিষ্ঠ ভক্ত যে সস্তা খ্যাতি লাভের জন্য উপরোক্ত লক্ষণগুলির অনুকরণ করে, সেই প্রসঙ্গে এই সমস্ত ভাবগুলির আলোচনাত্মক ব্যাখ্যা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর করেছেন। কেবল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নন, শ্রীল রূপ গোস্বামীও এই সম্বন্ধে আলোচনাত্মক ব্যাখ্যা করেছেন। কখনো কখনো প্রাকৃত সহজিয়ারা ভগবৎ-প্রেমানন্দের এই আটটি লক্ষণের অনুকরণ করে থাকে, কিন্তু সেই সমস্ত কপট অনুকরণ তখনই ধরা পড়ে যায়, যখন দেখা যায় যে সেই সমস্ত কপট ভক্তরা নানারকম অবৈধ কর্মের প্রতি আসক্ত। ভক্তের বেশ ধারণ করা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি ধূমপান, আসবপান অথবা অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গের প্রতি আসক্ত থাকে, তা হলে সে কখনোই উপরোক্ত ভাবের লক্ষণগুলি উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় যে, এই সমস্ত লক্ষণগুলি স্বেচ্ছায় অনুকরণ করা হচ্ছে, এবং তাই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সেই সমস্ত অনুকরণকারীদের পাষাণ-হৃদয় মানুষ বলে বর্ণনা করেছেন। তারা কখনো কখনো এই সমস্ত অপ্রাকৃত লক্ষণের আভাস হয়ত অনুভব করতে পারে, কিন্তু তারা যদি অবৈধ কার্যকলাপগুলি পরিত্যাগ না করে, তা হলে তাদের পারমার্থিক উপলব্ধির চেষ্টা অবশ্যই ব্যর্থ হবে।

কভুরে গোদাবরী নদীর তীরে যখন শ্রীল রামানন্দ রায়ের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হয়, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাচ্ছিল, কিন্তু রামানন্দ রায়ের পার্ষদ কতিপয় অভক্ত ব্রাহ্মণের উপস্থিতির ফলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভাব সংবরণ করেন। তাই কখনো কখনো পারিপার্শ্বিক অবস্থাজনিত

কারণে মহাভাগবতের শ্রীঅঙ্গেও এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে দেখা যায় না। তাই প্রকৃত স্থায়ীভাব যথাযথভাবে প্রকাশিত হয় *ক্ষান্তি* (জড় বাসনার সমাপ্তি), *অব্যর্থ কালত্বম্* (প্রতিটি ক্ষণ ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত করা), *নাম গানে সদারুচি* (নিরন্তর ভগবানের মহিমা কীর্তনে ঔৎসুক্য), *প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে* (ভগবানের ধামে বাস করার আকর্ষণ), *বিরক্তি* (সমস্ত জড় সুখের প্রতি পূর্ণ অনাসক্তি), এবং *মানশূন্যতা* (গর্বহীনতা) আদি গুণগুলির মাধ্যমে। যিনি এই সমস্ত অপ্রাকৃত গুণগুলি অর্জন করেছেন তিনিই প্রকৃত *ভাবদশা* প্রাপ্ত হন, পাষাণ হৃদয় অনুকরণকারী প্রাকৃত অভক্তরা কখনোই সেই দশা প্রাপ্ত হয় না।

সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটির সারাংশ বিশ্লেষণ করে বলা যায়—অনেক উন্নত ভক্ত সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধ হয়ে ভগবানের পবিত্র নাম জপ করেন এবং যিনি সকলের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন তিনিই বাস্তবিকভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তনের অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন; এবং সেই উপলব্ধি পরিলক্ষিত হয় সবরকম জড় বিষয়ের প্রতি বিরক্তি আদি উপরোক্ত লক্ষণগুলির মাধ্যমে। ভগবদ্ভক্তির নিম্নতর অবস্থায় অবস্থিত হওয়ার ফলে কনিষ্ঠ ভক্তেরা স্বভাবতই মাৎসর্যপরায়ণ, এবং তাই তারা আচার্যদের অনুগমন না করে নিজেদের মনগড়া ভগবদ্ভক্তির বিধি-নিয়মের উদ্ভাবন করে। আপাতদৃষ্টিতে নিরন্তর ভগবানের দিব্য নাম জপ করার অভিনয় করলেও তারা ভগবানের নামের অপ্রাকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে পারে না। তাই, তাদের অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা ইত্যাদি নিন্দনীয় অপরাধ ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের উদ্ধারের একমাত্র পন্থা হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের সংস্পর্শে তাদের এই সমস্ত বদ অভ্যাসগুলির সংশোধন করা; তা না হলে তাদের পাষাণ হৃদয় কখনোই দ্রবীভূত হবে না এবং তাদের ভবরোগেরও নিরাময় হবে না। আমাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথে আমাদের প্রগতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে তত্ত্বদ্রষ্টা ভগবদ্ভক্তের নির্দেশনায় শাস্ত্রের উপদেশাবলী অনুসরণ করার উপর।

শ্লোক ২৫

অথাভিধেহ্যঙ্গ মনোঽনুকূলং
প্রভাষসে ভাগবতপ্রধানঃ।
যদাহ বৈয়াসকিরাত্মবিদ্যা-
বিশারদো নৃপতিং সাধু পৃষ্টঃ ॥ ২৫ ॥

অথ—অতএব; **অভিধেহি**—কৃপাপূর্বক বিশ্লেষণ করুন; **অঙ্গ**—হে সূত গোস্বামী; **মনঃ**—মন; **অনুকূলম্**—আমাদের মনোবৃত্তির অনুকূল; **প্রভাষসে**—বলুন; **ভাগবত**—মহান্ ভক্ত; **প্রধানঃ**—প্রধান; **যদাহ**—তিনি যা বলেছেন; **বৈয়াসকিঃ**—শুকদেব গোস্বামী; **আত্মবিদ্যা**—অপ্রাকৃত জ্ঞান; **বিশারদঃ**—দক্ষ; **নৃপতিম্**—রাজাকে; **সাধু**—অতি উত্তম; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে।

অনুবাদ

হে সূত গোস্বামী! আপনার বাণী অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। তাই, আত্মবিদ্যা-বিশারদ মহাভাগবত শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছিলেন সে কথা আমাদের কাছে কীর্তন করুন।

তাৎপর্য

শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতো পূর্ববর্তী আচার্যেরা এই জ্ঞান বিশ্লেষণ করে গেছেন এবং সূত গোস্বামীর মতো পরবর্তী আচার্যেরা যেভাবে তা অনুশীলন করেছেন তা সর্বদাই অত্যন্ত বলবতী দিব্য জ্ঞান, এবং তাই তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী এবং সমস্ত শ্রদ্ধালু শিষ্যদের পক্ষে লাভপ্রদ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের 'শুদ্ধভক্তি ঃ হৃদয়ের পরিবর্তন' নামক তৃতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।